রাজস্থান ডায়েরিজ়

সিন্ধু সোম

রাজস্থান
ডায়েরিজ়

রাজস্থান ডায়েরিজ়

একটি দিনলিপির ভূত

Rajasthan Diaries
Ghost of The Travelog
By Sindhu Som

রচনাকাল: ২০১৮ (অক্টোবর—নভেম্বর)

প্রকাশকাল: ২০২২

অপরজন ওয়েবজিন-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ ও ক্যালিগ্রাফি: দীপ হাওলাদার

কৃতজ্ঞতা: মেহেদি হাসান ও অভ্র কি-বোর্ড

কৃতজ্ঞোৎসর্গ

বেবিদার উৎসাহ ছাড়া এ লেখা হতই না হয়তো কোনওদিন। তাই বেবিদাকে...

এবং সেই সমস্ত পাঠককে যারা পিডিএফ চেয়ে রাখবেন কিন্তু পড়বেন না...

এন্ট্রি ১

চোখটা সবে মোবাইল পর্দা ছুঁয়েছে। চোখ তুলে জানলায় স্থির। কপালে। কালি পুজোকে বাইরের দোরে দাঁড় করিয়ে রেখে। ঝিঝিক ঝিঝিক ঝিঝিক ঝিঝিক ঝিঝিক ঝিঝিক। চাকা। ঘোরে তালে তালে। বদলে যায় মুহূর্তে প্রকৃতি। মাঠ হয়ে যায় বালিয়াড়ি। মুকুটের মতো এক দূর্গ। খানিক দূরে একটা গাছ। একটা গাছ। একটা গাছ। ছেড়ে ছেড়ে। গায়ে অভিশাপ। দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে ছিলাম! কত হাজার জন্ম আগে। দুরু দুরু। বুক থেকে অতীতে।

আমার এক হাতে আঙুল রাখে ফেলুদা। পায়ের পাতার পাশ দিয়ে সরসর করে হেঁটে যায় একটা কাঁকড়া বিছে। জটায়ু গোঁফের নীচে ভেজা হেসে বলেন-"উটের সম্বন্ধে প্রশ্ন চলবে?" ধুলো উড়িয়ে ছোটে। উট। তপসের হাসিমুখ দোলে। ল্যাগব্যাগ ল্যাগব্যাগ। দিগন্তের ঝুঁকে আসা উদারতার বুকে একটানা। বাসা খোঁজে মন্দার বোস। সন্ন্যাসীর সাদা কপাল। “আছে আছে, আমাদের টেলিপ্যাথির জোর আছে”। হাওয়ায় তালি। মন্দার বোসের মুখটা ঝুলে যায়।

আমি ঘাড় নেড়ে আকাশকে জানাই-"মনে পড়েছে।" ধড়মড় করে উঠে বসে ডঃ হাজরার লাশ। ট্রেনের জানলারা পালাতে পারে না। একই রকম থেকে যায়। জানলার কাঁচের দাগে প্রজন্ম লেগে থাকে। নায়কের মুখটা মনে পড়ে। দিতিকে বলি, “সব গুছিয়েছো তো?” ধুপ ধাপ। পায়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় পায়ের শব্দ। রাজধানীর শক্তিশেল মরুভূমির বুক চেরে। থরে থরে পাথর। বেড়ার আড়াল। নিরেট। থমকে পড়া যেন পছন্দ করে না গতি। তাকে হাতে আড়াল করে। এভাবেই একই পথ ধরেছিল বহিরাগত। এখন তাদের

মেজে ঘষে নিয়েছে। মরুর আঁচলে বড্ড মনকেমন। বাইরের পাথরের সঙ্গে পাল্লা দেয় বার্থ। জন্ম? নাকি শোওয়াটাই অচল? সিটের গলিতে টুং। টাং। কাবুলিওয়ালার সেলফোন ডাকে মাথাখোলা এক বুড়ো—

"অমরত্বের প্রত্যাশা নেই, নেই কোনো দাবি-দাওয়া
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকেই চাওয়া"[1]

চাওয়া...চাওয়া...চাওয়া...
শব্দের ভগ্নাংশ মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।

আলোকলেখ্য—স্বয়ং
২৩শে অক্টোবর ২০১৮
সকাল ৮টা ৩৬

---
[1] কবীর সুমন

বালিও না-চাকা দাগী মোহনা জানায় রেতঃস্থানে

এন্ট্রি ২

হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে এসেছি বেশ কয়েকটা বাবলা ঝোপ। ওঁত পাতে। বিড়ালের মতো। তাতে কয়েকটা জন্মান্তর ফলে রয়েছে। ঝুপুস। বড়দিনের ঝোলা। গাছের বুক দেখা যায় না। ঝুরঝুরে। লালমাটিতে লাঙল ঠেলছে চাষী। কপালে ঘামের দানা। ওতে সঙ্গীতের সুর বসে। জীবনের আরেক নাম ঘাম হতে পারত। কয়েকশো বছর আগেও ঠেলত ওরম। ও নয়। অন্য কোনও হাত। বলিষ্ঠ। পেশির মহাকাব্যের আগে প্রকৃতি সওগাত নামিয়ে রাখে। সেই চৌকাঠে, সেখানে, এই 'অহং'-এর অস্তিত্ব ছিল কি?

"একদিন রক্ত-মাংস থাকবে না আর

আমিও সেই দিগন্তের নিস্তব্ধতার দিকে চলে যাব।"[2]

ঠং ঠং করে একটা ঘন্টা পড়ল ফলোদি স্টেশনে। কিরকির। বালির স্বচ্ছ চাঁদোয়া মেঝেয়। লোহার গাড়ি ঢুকল ঠেলে। দুটো তিতির ইতি উতি ফুড়ুৎ। ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ভেসে আসছে ইতিহাস। তার বুকে স্থির। একটা লোক ছায়ায় বসে। ধোঁয়াতেও কর্ষন হয়। ইন্টিগ্রেটর। পুরো গোলাটাই তার কৃষ্টির অধীন। বিড়ি। জল। স্টেশনের একপ্রান্তে পা পড়ছে। ছলাৎ ছল। তার সুর।

"তারপর সান্ত্বনার মতন নীরব

শত তার প'ড়ে থাকে পরিপূর্ণ ঘাসে

---

[2] জীবনানন্দ

বিকৃত নয় ক’ কোনও শব

মায়াবী দরজায় ধূসর নীরব

সূচনা সে---অবিরাম শান্তির সকাশ।”[3]

আমরা জেয়সলমীরের পথে চলেছি। পথের সাথে চামড়ার টান। শুকনো, শুকনো অতীব শুকনো। তবু ভেজা। ভজনা। রাতের ট্রেন। পেরিয়ে উঠে আসে আলোয়। শুষ্কতার পরতে পরতে লেগে থাকে ইতিহাস। দাবানলের থেকে বেশি তার বুকের খবর কে রাখে! সীমিত জীবনের পিপাসা। নাছোড়বান্দা অশিক্ষা-বকবকমের মুখোমুখি। সহ্যশক্তির পরীক্ষা। যুদ্ধের পীঠ। সিলেবাসে তার আক্রমণাত্মক বড় প্রশ্ন। চলার অসীম ক্ষমতা সহ্য করতে করতে অচলার কান্না কানে লাগে।

“নাস্তিকের সেই শিকল ভাঙ্গা ভৃত্যকে---

নিরর্থের বোঝায়

বেঁকেছে যার পিঠ,

[3] জীবনানন্দ

নেমেছে যার মাথা”[4]

কে তুমি? দিতির পাশেই। মাশকারার পাড় বেয়ে বুকে নামে মন। নামতে চায়। ঠোঁট। পথ আটকায়। আস্তে আস্তে আবার সূর্যাস্ত হয়। সিঁথিতে সাম্রাজ্যের রক্ত। দিতির গালে তার লজ্জার রঙ লাগে। এভাবেই স্মৃতির দেয়ালে মাথা খোঁড়ে মন। যখন বরণডালা বিস্মৃতির হাতে। বিবাহিতা! বুদ্ধ তাতে আলোকপাত করেন। সমান্তরালে। দিব্য হয় শ্মশানের রাস্তা। একটা আলো একটা আলো একটা আলো। দোলে। দূরে। দুলছে। দুলছেই...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৩শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ৯টা ২

[4] রবীন্দ্রনাথ
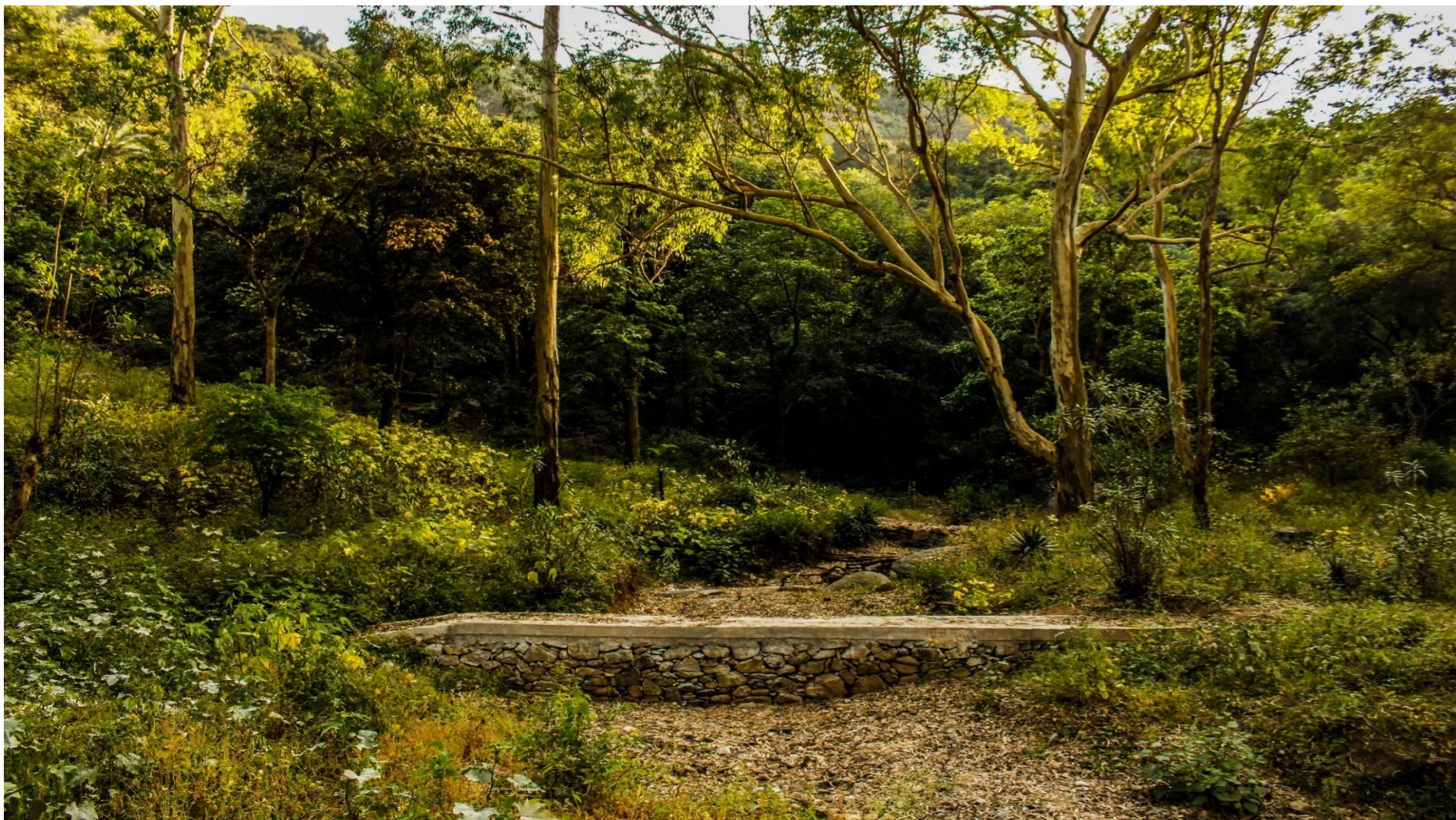
'যখন' একটি যৌনতাবাচক শব্দ। যা-তে ঝুল খেয়ে বালিও বনানী বুকে রাখে

এন্ট্রি ৩

ভলকে ভলকে আসছে কালো মেয়ের মতো একটা কিছু। “কি গো?” দিতির ডাক। নেমে দেখি। প্রাগৈতিহাসিক। মানিকের পাতা থেকে ক্ষণিকের ডানায়। ডিজেল ইঞ্জিন। খুঁড়িয়ে হাঁটে। চঞ্চল চোখের ফাঁকে উঁকি দিয়ে যায় হারানোর প্রতিশ্রুতি। সর সর সর সর। আবার পিছিয়ে গেল রোদ। সময়ের বেণীটা জোরে একবার টেনে দিয়ে। ঘাঘরা পরা ছোট্ট সময় কাঁদতে কাঁদতে ছুটল পিছন দিকে।

পায়ে পায়ে লাল পাথর। আঙুলে লাগে। ঝুপ ঝুপ ঝুপ। পায়ের পিছনে পা। জুতো খুলে যায়। আবার সামলানো। হঠাৎ থামল এসে। খাদের ধার। কয়েকটা লাল কাঁকর গড়িয়ে পড়ল ছিটকে। ধাপ ধাপ। আতঙ্কের পরেও নিস্তব্ধতা থাকে। লাল পাথরের শোয়া খাদের বুকে একটা কঙ্কাল। হাড়ে ভাঁজ। ভাঁজে হাড়। মাঝে যৌনাঙ্গের দাগ। চেরা চামড়ার স্খলন। এক দুই তিন। পাঁজরের ফাঁকে বাসা করে অমাবস্যা। টিপ টিপ। টুপ। সময় ভয় ভয় চোখে তাকল রোদের দিকে। রোদের কুয়াশা কুয়াশা জন্ম। তীব্র গন্ধের নমনীয়তা। আমার মুখে ঢলে পড়ল রোদ। তারপরেই অন্ধকার।

একটা উঁচু ঢিবি। বেশ উঁচু। মাথার কোলে ওরা কারা? ঝাপসা মানচিত্র। আমি আর দিতি। বসার উৎকণ্ঠা। চোখে চোখ। টুক টুক করে হেলতে থাকে ছায়া। জন্মান্তর। ফিরে দেখা স্থাপত্য। পাশাপাশি। গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীদের প্রতীক্ষায়। থামের শালবন। পোখরান পোখরান গন্ধ বাতাসে। আমি দিতির কাঁধে হাত রাখলাম। একটু শিউরে উঠল কি? আজ দুজনের মাঝে বেশ কয়েকটা জন্মের গভীরতা।

আবার ডিজেল। নামতার বোল। কালোর ওপর কালো। মেঘ। বৃষ্টির অপেক্ষায় পাথুরে কুয়ো। রাস্তার হাত তার বাঁকা কোমর জড়িয়ে। লাল বাতি। কাটা নেই। বাঁধার কিছু নেই। তাই বাধাও মুখ লুকায়। শুধু মাঠ। মাঠের মতো। দূর থেকে ধুলোর রাস্তা। ছুট ছুট ছুট। ডুব। লাইনের সামনে এসে মাথা নামিয়ে যেন মাঠের পুকুরে ডুব দিল সে। আবার উঠল গিয়ে ওদেশে। মাথা নামানোর সঙ্ঘবদ্ধতা। অন্ধকারের শর্টকাট। মিহিজামেও এমন এক দুই সুড়ঙ্গ আছে। গুপ্তধন। ডালার ওপারের হাতে মুঠো মুঠো। খুলে দেখি। সময়ের ফেলে যাওয়া গয়না।

আমার প্রেম মুহূর্তের পর মুহূর্ত ঠিক এভাবেই আকন্দের গলায় ঝুল খায় এখানে। ঝুল খায় ওখানে। একটু বেশি নীল। একটু বেশি লাল। অন্ধকার বেগুনী ঠোঁটের মতো পানের লাল দাগ গোটা উপত্যকা জুড়ে। লিপস্টিকের থেকে অনেক বেশি চিরস্থায়ী। রক্তের থেকে বেশ খানিকটা হাল্কা। বেশ খানিকটা...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৩শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ১১টা ২০

উঁকি “তার কবেকার” বিগ্রহ ভেঙে ভেঙে চলে, পাতা থেকে শবের আঁচলে......

এন্ট্রি ৪

লাঠি এসে গেছে, লাঠি এসে গেছে। এল অনেকক্ষণ পরে। স্টেশনের নাম লাঠি। ট্রেনের ছায়া নেই কোনও। রোদ এসেছে তখন নিমগাছের ওপর। টুকরো ডানা। থিরথির। গরম হাওয়ার ওঠানামা। নিম গাছ? মরুভূমির পাশে? ওরম। ওরমকমই। ধূসর দুপুরে আড্ডা জমায় একটা বট। স্মৃতির ধারাবাহিক। গোল। থেকে গোল। বৃত্তের আকারে বয়স। ছোপ ছোপ। একটা গেট পাথুরে আশ্বাসে। সবুজ প্যান্টের দুটো চুলছাঁটা ছেলে নেমে গেল। মিলিটারি। ধূসর ক্যানভাসে স্প্লিন্টার। সবুজ কার্পেট। আশ্চর্য! জীবনের রঙটাও খানিকটা ওরম। শক্তি শুকনো ঠোঁট চাটেন। কানের মধ্যে গরম সুরা।

"মানুষের ভেতরের আলো তাকে পথ থেকে ঠেলে
নামায়, যেখানে কাঁটা ঝোপঝাড় এইসব
চোখে পড়া পথ নেই, আছে---যাতে বুকে হেঁটে যাওয়া..."[5]

[5] শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একটা ন্যাংটো ছেলে হাঁটু অবধি জামা পরেছে। মন দিয়ে উল্টাচ্ছে। হাতে একটুকরো কাগজ। ও কি! মনকেমন! দিতির চিঠি বুঝি? বালিতে জন্মান্তরে ধূসর হয়ে গেছে? চিঠি মেখেছে। মাখতে থাকে ধোঁয়াশা। আকাশ গলে পড়ে। হলদেটে দাগে অতীত হানে বন্যতা। একদিকে দিগাঙ্ক লাল। থরথর করে কাঁপছে জোড়া বালি। যন্ত্রদানব জন্মান্তর নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওদের ওতে যাবার কথা। সেই চুল ছাঁটা জীবন। বোতলের ঝঙ্কারে অবান্তর কবিতা ফুটে ওঠে। কে যাবে? কে যাবে রেএএএএএএ! শিউরে ওঠে বাচ্চাটা। তার কামানে জলের গোলা। তাতেও বালি আগাছা দেয় ফসল করে। রাষ্ট্রতীরে রক্ত ফেনার নদী। তাতে বয়ে আসে গণসজারু। মোটা মোটা খোঁচার নাগালে। ফণীমনসা সেলাম ঠোকে। মরা ছোট্ট দুটো পা নজর আনে। টানতে হয়। "এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?" বাচ্চা-ঘুড়ির মতো ঘুম ক্ষিদে-মায়ের মতো কোল পাতে।

"বাজ পোড়ানো গাছের নিচে নষ্ট পাথর
কেউ দেখেছে দুই পা"[6]

লাঠি নিয়ে টুকটুক। টুকটুক। কুঁজো হয়ে কাঁপে। থরথরিয়ে আসছে দিগন্ত। পচ। এতটা পিচে লাল হয় এখানে ওখানে বালি। হেলে দুলে। তাড়া তার নেই। পথের দুপাশ। ফেরার পথের চিহ্ন রাখে গরু ছাগলের কঙ্কাল। সংগ্রহতে বিয়োগের আগাম অতীত বার্তাকু। এরকম একটা ছাদ ছিল। জল ছিল। বাবলার হাত ধরে হাঁটতে বেরিয়ে ঠিক কয়েকশো বছর আগে এভাবেই পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম

[6] শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি। চিকচিক। রোদ। কপালের জল জিভের উপর। মুখ পুড়ে মুখপোড়া। জ্বলে গিয়েছিল বুক। হাপরের টানে তখন আঁচ নিয়েছে পৃথিবী। দিতি বলে প্রকৃতি? আমি বলি, মিথ্যে কথা। আমার প্রকৃতি দিতির অবয়ব। তাই ঈর্ষা করে। ঈর্ষা করে অস্তিত্ব। জন্মান্তর তারই কাব্য। ঈর্ষা মহাকাব্য ভাসিয়ে তুলতে পারে বহুদিন। একা শেষ শ্বাস টেনে শোওয়া। আমার হাড়ের ওপর দিয়ে ছুটে গেছিল কেউ। এগিয়ে গিয়ে দেখি দুটো হরিণ। বাবলারও ছায়া হয়। তুমিও অপেক্ষায় ছিলে।

একটা মোটা বাবলার ছায়ায় ত্রিশটা ভেড়া। "............জল নয় কাঠ ও পাথরে / প্রতিশ্রুতিহীন কাঠ আমাকে নিজের করে নেবে"[7]। নাকে নথ। ঝিকমিক। ঘাঘরার ফাঁকে ফাঁকে। এক পা দুই পা। ওদের চরাতে আসতে দিতি তখন। তোমার খোঁজে চরম আকন্দ চুম্বন। আস্তে আস্তে ধুলোয়। মিলিয়ে এল আকার। তবু খাঁচা রয়ে যায়। আমার কঙ্কালের বেড়ে দিতির অক্ষর খোদাই করা আছে। আমি নিজেকে নিজের বাইরে দেখেছি। রোদ আমায় ধমক দিল, "ধুর! তুই বড্ড আঁচল ধরে থাকিস।" আমি সময়ের চোখে ঠার। তাই? তাই তো। আমার গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। আঁচল পেতে বসত আলপনাদি। আমার হাতের মুঠো ঘেমে উঠত। সেই গ্রীষ্মের দুপুর। একটানা ওঠানামা। আমাদের শরীরে ঘামের গন্ধ। বাতাস ছুঁইয়ে যেত বুড়িকাঠি। তোমার আঁচল ধরেই ছিলাম দিতি। টানতে পারলাম কই! সে জন্ম অভিশপ্ত। এ মৃত্যুর প্রান্তরের মাঝে উদ্দাম মিলনের সহজিয়া ছিল। জীবনের চূড়ায় পৌঁছোনোর কথা হতে পারত। আমার নমনীয়তায় ছোঁয়া যায় নি দিতি। সেবারের মতো। ক্ষমা। ক্ষমা। ক্ষমা।

ঝুরঝুরে হাত। আজও বাবলার কাঁটায় কাঁটায়। রুমাল? না না! কাগজ। জমাতে পারে নি বাচ্চাটা। তোমার উড়তে থাকা আঁচলে কাল

---

[7] শক্তি চট্টোপাধ্যায়

রাতের ভেজা গন্ধ। সন্ধানে সন্ধ্যা আনে একাঙ্ক নাটক। মরুভূমির যৌনতা আমি হাজার বছরেও খুঁজে পাই নি। কলকাতার ঘুপচি ঘরে। একা পুড়তে থাকা লণ্ঠনে। তীব্র শিস। বিছানার ঘটাং ঘটাং। বস্তিতে প্রাণ নামে রাতে। ঝড় ওঠে। খুশির তীব্রতা-বিহ্বল চার চোখ। সময়ের কাঁপতে থাকা ছায়ায় ট্রেন থেমে আসার আশ্বাস। অনেকটা রতিতৃপ্ত যৌনাঙ্গের মতো...

আলোকলেখ্য- স্বয়ং

২৩শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ১২টা ৪৩

ইস্টিশানিত হা হা করা চাতাল আর বিছানার সঙ্গমে ওম ওঁত পেতে থাকে

এন্ট্রি ৫

উলস্‌। বাপরে! ভীষণাকৃতি বিভীষণ লঙ্কার চপ পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল। শশামার্কা লঙ্কার তেজেই কি দূর্গার অকালবোধন? কৃত্তিবাস কেঁপে ওঠেন। শীত মরুর বুকে মুণ্ডনের মতো আসে। ডানপায়ে তার বিষফোঁড়া। গ্যালগ্যালে। মাছি তাড়ায় রামধনু। রাম তো রাজস্থান আসেন নি। রামে আর থরে জটাজটি। সে কি চুমুক! সুকুমার রায় চশমার ওপর দিয়ে স্থির। ঝপাট লপাট। লু-এ উল্টে আসে পাতা। থর শিরস্ত্রাণ খুলে রাখে। চুমু খায় রামগালে। নাহ্‌! দাড়ি নেই একফোঁটা। দুপাত্তর পড়লে অমন হয়। তারপর? আর রেলের মজা পায় না পথের পাঁচালী। অপুর চোখ। টেনে আনেন কৌশিক গাঙ্গুলি। কাঁচের বয়ামে রাখেন সাজিয়ে। একঘেয়ে কষা কষা ঘাম। বিবাহিতার এক ঝলক। আমাদের সঙ্গে মালপত্তর আছে। ওজন। কথায় ভারী হয়ে আসে পা। ওভারব্রিজটা লম্বা হতে থাকে। থাকে। থাকে। থাকে। থাকে। দুমড়িয়ে ঘুরিয়ে দেয় কেউ। হলুদ শাড়ি। সোনার শাড়ি! ঝুম ঝুম ঝুম। নূপুর পরে ছুটে গেল দিতি। দিতির সঙ্গে ভাব জমায় বিবাহিতা। তাতে তাস গোনার সংকোচনটা লেগে থাকে। মনের ভেতরে হাফ প্যান্ট কুশলের কোঁচকানো ভুরু। বিরক্ত হয়ে বকে ফেললাম- "তাং মাত করো, তাং মাত করো!"

হেই লাও! গাড়ি নড়েচড়ে না। ক্রঁক ক্রঁঅঅক। শব্দের উপসংহার। আড়াই দিনে মুক্তি।

“চরিতার্থতার শেষে আছে কি বিস্ময় ঘেরা দেশ

মুক্তির সংস্রবহারা এ দিনযাপন?

কিম্বা মুক্তি মৃত্যু ও শৈশবে।”[৪]

ছুটতে গেলে একটা জেলখানা লাগে। তার দরজায় খর চোখে দপদপ করে। ওভারব্রিজটা ফট করে শেষ হয়ে যায়। হিসেব বাড়ে। ছায়ার করিডোরের ওপারে অপেক্ষা করছে রোদ। ওর আবার নিচের দিকটা অপছন্দের। পাথর। ঘের কাটা স্বপ্নের নক্সা। কাগজ ফুল চুঁইয়ে পড়ে। জেয়সলমীর স্টেশন মাস্টার ঝিমায় দুপুরে। মনে পড়ে। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে এসেছি। আস্তিন টেনে ঠোঁটে ডুব। ভিজে দৃষ্টির পিছনে ফুটে ওঠে সোনার কেল্লা। বাজারে তন্ন তন্ন করে খুঁজে সোনার পাথর বাটি পাওয়া যায় না। এভাবে আগন্তুক চিরকাল শহুরে খোঁজ করে। ঘোমটা তুলে গ্রামের খোঁজে বাধা দেয় ভ্যানিটি।

এই রঙ খানিকটা পড়ে গেছিল। সত্যজিতের সিঁদুরের কৌটো। মনে পড়ছে। ঠুন ঠুন করে তাল দিয়ে গাইত আল্লারাখা। শিকড় যখন সোনালি হয়ে ওঠে হলুদ প্রেম তার পথ সাজিয়ে রাখে। অভিসার দিতি। ঐ মস্ত নথের প্রতিফলন। ও যে মণির মতো জ্বালিয়ে দিত বুক। অত উঁচু বুকে ছোঁয়া লাগে বারবার। আসতে যেতে। দেয়ালেরা নির্দয় হয়ে ওঠে। জায়গা ছাড়ে না এক তিল। আবার বিবাহিতার সচকিত দুচোখ। আড়াল যখন বিপাশা হয়ে ওঠে, কালো বেড়ালের মতো ছুৎমার্গে বেড়িয়ে আসে মন। মুখে ঝোলে। যৌন অস্বস্তির পেটি। সদ্যচুরির গন্ধ তার গায়ে। দিতি আমার গা ঘেঁষে বসে। ডিজেল অটো গড়িয়ে যায়। রাস্তা ছেড়ে দেয় পথ। সরে দাঁড়ায় বিমূর্ত। একটা দূর্গ। হোটেলে উঠে আসে দাম্পত্য। অদাম্পত্য। আধিপত্য। অনাধিপত্য। টেবিলের ওপর একা হাসে বুদ্ধমূর্তি।

[৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ব্যালকনি। কফির গাঢ়ত্ব আমাকে প্রলুব্ধ করে। সিঁদুর মুছে যায়। দিতির কাজলের কাছাকাছি নেমে আসে সন্ধে। আমরা স্থির জেয়সলমীরে। নগর পালিকা কার্যালয় আমাদের বাসরের সাজে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তকাল। অহল্যাকে মনে পড়ে। পাথরের অভিমান কুঁদে আরতির প্রদীপ ওঠে। আমার সামনে ভেসে উঠল কিছু গর্ত। পা এড়ানো যায় না। দিতি অস্থির হয়ে উঠল। অঙুলের আঙটি ছুঁয়ে চমকে উঠলাম। আজ রাতে এক বিছানায় তিনজন। হারেমের ঐতিহ্য বয়ে বেড়ায় হোটেল। মোটা ফ্রেম। ঝিলিক দেয় কাঁচ। আমি গোঁফের অমানবিকতায় আঙুল ছুঁইয়ে দেখি। ভেজা। বাথরুমের থেকে বয়ে আসে নদী। দেয়াল। খোপ খোপ। মহারাজ তাকিয়ে আছে দিতির দিকে। আমি দিতির চুলটায় নাক ডোবাই। বহুজন্মের অরাজকতার ছাপ। সন্দেহ। একটা দানা বাঁধে বুকের কাছে। ঠোঁট দিয়ে সরানোর চেষ্টা করি। আমাদের দুজনের মাঝখানে এলোমেলো হয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ আসে অহল্যার। সারারাত। ছিক ছিক ছিক। কাঁটা শুধরে দেওয়া প্রয়োজন। নইলে সময় রাগ করবে।

“একটি সতর্ক পথ—মুড়ো খোলা, লেজে চেপে জাঁতি

আমার ঘরের কাছে রেখে গেছে।

আকাশের মতো তাকে মনে হয়, কিংবা ফালিকাটা

দরজির দোকানে টুকরো কাপড়ের মতো ব্যর্থ মুখ

যাকে শুধু রজঃস্বলা দুই ঊরু ঢেকে দিতে পারে

আর কেউ পারেনা।”[9]

---

[9] শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অহল্যার ভাঁজে মন রেখে আমি বিবাহিতার চোখ ফুটিয়ে তুলি। পারতেই হয়। ইতিহাস আমার মাথায় হাত রাখে। টং ঠিসসস্। ঝলকে ওঠে তরোয়াল। বেয়ে বেয়ে নামে অনন্যতার কান্না। রাজস্থান বিবাহিতার প্রেম। 'সতীত্ব'-র পরিণতি জহরব্রত। সবুজ পুকুর। পানার রঙ আছে। পানা নেই। কয়েক হাজার প্রজন্মের গায়ে হলুদের রঙে পাথর হয়েছে প্রেম। কিন্তু সে রঙ কি সিঁথিতে পৌঁছয় দিতি? পাথুরে শয্যা, সিঁদুর আর গায়ে হলুদের রঙে ইতিহাস বিস্তর পার্থক্য লিখে রাখে। বিস্তর...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৩শে অক্টোবর ২০১৮

সন্ধে ৭টা ২৮

রঙ বোধে ছড়ে যাওয়া লুপে অনুপমা কাগুজনা শুরু করে, নিঃশ্বাস তখনও বাড়ে নি

পথকে বিবস্ত্রা করে ফেলে রেখে গেছে নতজানু আঁঠালো উচ্চারণ। সঘনঘটায় উচ্চারনে দীর্ঘায়িত শ্বাস

পালঙ্ক হোটেল-দেয়ালে একরশি সৎকারীয়েছে

এন্ট্রি ৬

ঢিলের ওপর পায়রা। ছবাং। গুঁড়ির টেবিল মালঞ্চ থেকে উঠে আসে। একটা পাথরের মার্জিনে বোঝাই রাস্তা আমাকে পিছু ডাকছে বারবার। দিতিকে বললাম। ও হেসে বললে, “রাস্তায় তো উপাদান বড় কম নেই!” উপাদান্যতার বদান্যতা। বটে। তাই হবে হয়তো! পা টিপে টিপে পা ফেলি। রাস্তাটা মোড় নিয়েছে কেড়ে। হঠাৎ যদি বেরিয়ে আসে বিবাহিতা? পৃথিবীর দাবিরা আমায় ক্ষমা করবে কি? সময় এলে বেশ হত। রোদ বলল, “আসবে আসবে। অত অধৈর্য হচ্ছিস কেন?” ঝেঁঝেঁ বললুম, “তুই সব জেনে বসে আছিস!” “আরে গুরু আমার বোন, আমি জানবো না!” রোদ কড়া হল একটু। লাল নীল হলুদ সবুজ কাঁচ ফুটে বাতি জ্বলে। রোদের হাতে পক্ষীরাজ। আমার হাতে ঘাম। বাসে করে রাত পেরিয়ে নৌকা। ঝিঁঝিঁ ডাকে। দিতির উপোস ভেঙেছে অনেকক্ষণ। চাকার তালে তালে ঢেউ পড়ছে। ও বিবাহিতার পাশে। ইচ্ছে করেই বসেছে। ভাব ভাব ছুঁইয়েছে মন। চোখে পড়ছে। আলাদা করে তাকাতে হয় না। ছোট্ট মূর্তি সাজিয়ে বসেছে হরিদাস। উঁচু নীচু প্রস্তর শিল্প তাকেই ঠেলে রেখেছে দূরে। বেচতে গেলে অভিমান করে সৃষ্টি। ঠোঁট ফুলে ওঠে তার। মন্দিরের ঘাট বাঁধানো সাধু। সাধুর তিলকে মাগুর মাছ ঘাই দিচ্ছে।

পরিত্যক্ত। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে। যতটা ফেলে যায় মানুষ, ততটাই ইতিহাস। জন্মগুলোও তাই। সুবিধে আছে। এই ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে বসে থাকাটা আমার বহু শতাব্দীর অভ্যেস। তখন ভিড় হত। মঞ্জীরে চীরে লেগে থাকত জলমিলনের দাগ। লিপস্টিকের স্খলনের মতো অস্থায়ীত্ব নিয়ে সে জন্মাত না। নতুনের বার্তা থাকত সেই স্তনভারাতুর বুকে। গোল মতো হাঁড়ি। অস্থিরতা। দ্বীপের মন্দিরে ঘনিয়ে আসে দুপুর। এখনও একা একা একা। কখনও তিনজনে। আতপ চাল ফোটার গন্ধ আসে। ঢাকা দে ঢাকা দে। দিতি

ভুরু তুলে শাসায়। আমি ইচ্ছা করে বিবাহিতাকে দেখি। বিবাহিতা নৌকোর কিনার চেপে ধরে। শক্ত করে। তাতে শক্তি লেগে থাকে। স্‌স্‌স্‌। একটা তীব্র শিস। আড়মোড়া ভাঙ্গে ফলনহীন বৈঠা। নীতি বৌঠাকুরাণী ও ঘাট থেকে দৌড়ে আসতে আসতেই উথলে ওঠে ফ্যান। এখন আর মাছের পেটে মহাভারত হয় না। দিতি ছাদের পায়রা দেখছিল। আমাকে পায়রা দেখতে অতটা চোখ ঘুরাতে হয় না।

খাঁচার দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমাকেই দেখছে। চোখ ফিরিয়ে নিল। আমার কলসিটা মনে পড়ে গেল। সিরসিরে নুপুর পা। পিছনে উটের চামড়ার নাগরা। পায়ে পায়ে ছোঁয়া লাগল না। একজোড়া ডুব। ইচ্ছাকৃত। বিবাহিতা না হলে হয়ত অবসর। ঝুঁকে পড়ে পুরুষের ঊরুর উৎকণ্ঠা। হেই হেই। নৌকা টাল সামলায়। চায় কি? এক সিঁদুরে হাজার জন্মের নীরবতা? দিতি আমার হাত ঠেলে। “যাও! না ডুবলে পূর্ণতা পাবে না যে!” বলি, “পূর্ণতা কি ডুবেই পাবো ভাবো? পূর্ণতার ফেরিওয়ালারা এখন খুচরো পুঁজিতে ডিম পাড়ে না কেউ। আমি বরং ডুবেই হীরে তুলি।” দিতি বোধহয় লজ্জা পেল। আমি জলে। চুউব। এবার পুরোটা তুলে ফেললাম নৌকোয়। দুটো হাতই আমার উরুর ওপর। নাক কামড়াচ্ছে নিঃশ্বাস। “এই!” আমি চমকে মাথা তুললাম। সময় কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে হাসছে। “কখন এলে?” “অনেক অনেক ক্ষণ!” বিড়ম্বনা। তাই প্রশ্নচিহ্নের টিপ।

রোদ বলল, "বিপথে যাবি না?" আমি উত্তরে হলুদ সূক্ষ্ম ডিভাইডারের দিকে তাকালাম। একগাছি দাড়ি। সাতরংগা। ভাঙা ভাঙা। হারমোনিয়াম দেখলেই আরাকানের রাজসভার ঢুলু চোখ মনে পড়ে। ঝিলমিল ঝিলমিল। চোখ ঢাকে ক্ষয়ে আসা আহ্বান। আরাকানে দিতি থাকলে আমি বিদ্যাসুন্দর লিখতাম। গরিসর লেক ক্রপ করলে পুঁথি কুড়িয়ে পাবে একদিন অজানা পথিক। উদ্বেগের আলে চলতে চলতে।

আমি রোদকে প্রায় কোলে নিয়ে বসেছি। আমার মুখ লাল। দিতির গালের টোলে আমি আদিম হয়ে উঠছি। দিতির বুকের স্নিগ্ধতা আসছে। কখনও কখনও উচ্চতাই সুরভী আনে। বিবাহিতার ঠোঁট অমন লাল হয় কেন? দপ দপ। আমার শিরা ওঠে নামে। হলুদ শহরে একা একা একা ঝুমুরের বোল উঠেছে। আমি জেয়সলমীরের মন পেয়েছি কয়েকশো বছর আগে। এবার দানখণ্ডই একমাত্র পথ। দিতির আঙুল, বিবাহিতার ঠোঁট আর চেতকের দৃপ্ত ক্ষমতা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিচ্ছে। রোদের দিকে সোজা তাকিয়ে আমি ওর আরাম শুনছি— চিঁহিহিহিহি, চিঁহিহিহিহিইইই।

কালো দিঘী অচলতা নিয়ে হাজার হাজার জন্ম অপেক্ষায় থাকে। একটা সাদা পাথর। আন্দোলন আর হলুদ গড়ে ওঠা শরীরের জন্য। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা...

আলোকলেখ্য— স্বয়ং

২৪শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ৩টে ৩

জলে না দাঁড়ায়ো শ্যাম জঙ্ঘা পেতেছি / চরণ কাঁটার তালে বুক বাঁধিয়াছি / ঘাটে ঘাম যৌতুকে দিও!

নাও ডুবাইলে সখা / ভাসি বান্ধিলে / জলের অনল মোর আঙ্গিনায় নিলে

এন্ট্রি ৭

ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর। ঘঅঅঅ। ঘাড় বেঁকিয়ে লালচোখ। তীর মারছে। আঃ! কাজ করছি তো নাকি! আবার শীতের টুপি কুশল। সোনার কেল্লা। মানিকদা মানিকদা আর মানিকদা। বাসের মাথার ওপরে অটোর দৌরাত্ম্য। লোকাল দাদা। ঠিক করতে গিয়ে নতুন ভাবে বাঙালি হলাম। মানে রঙ লাগল ঠিক। বাস ঠেঙাতে বেজার পাবলিক ফটোগ্রাফার ঠেঙাচ্ছে আজকাল। খবর ছিল। দিতি বলল, "তুমি কি ওসব কুড়োবে নাকি?" আমি তখনও ভেবে উঠতে পারি নি অরণ্যের শীতলতা। বললাম, "ভিজে ল্যাতপ্যাত করবে না। দৃষ্টি ভিজাতে অনেকটা আসব লাগে দিতি।" ঢোকার মুখে ডাক্তার। কঠিন মুখে টিকিট চাইল। ওতে অসম্বৃত আলোচনা আছে। চৌদ্দটা ইনজেকশন নিয়ে তবে পা রাখা গেল।

রোদের বাড়ি এসেছিল মেঘ। দুরু দুরু বুক। ছলাৎ। কে কাকে দেখে! আকাশকে বলে বলে বৃষ্টির পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজি করানো গেল না। আমি দেখলাম দূর থেকে হেঁটে আসছেন বিদ্যাপতি। অস্পষ্ট বিড়বিড় শোনা গেল দেয়ালের গায়- "চরণ কমল কদলী বিপরীত। / হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।। / কে পতিয়াওব এহু পরমান। / চম্পকে কএল পুহবি নিরমাণ।।"[10] মালদায় একটা শিল পড়ল গঙ্গায়। লক্ষী থুড়ি লছমির চাঁদ একটা দুধের বাচ্চাকে মাইয়ে ঠুসে ভিক্ষা করছে। দর্শনীয়রা দু তিনটে সাইট সিন দাবি করে ওমন। বাটিটাই সম্পূর্নতার প্রতীক।

---

[10] বিদ্যাপতি

একটা নাকছাবি আর নামানো দুটো চোখ। দুচোখে টানা কাজল। বিবাহিতা আমার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়ালো। দিতির সানগ্লাস ওর সঙ্গে ম্যাচিং। বেশ পাতিয়েছে। পুরোন ধুলো তাড়া করে ফেরে নীল আকাশ। রোদ আসছে মাঝে মাঝে। ওর এখন বেশি সময় নেই। আমি পাতা উল্টাই। কয়েক হাজার বছর আগে মালবিকার বাগানে এসেছিল এক গ্রীক। তখন দিতি ওর কোলের কাছে গান শিখত। এখন অহল্যার সংসার পাথরের কাছে মাথা ঠুকে মরছে বারবার। একটা অবিচ্ছিন্নতা কোথাও রয়ে যায়। সিকেয় মাথা ঠেকতে ঠেকতে ওটাই অভ্যাস। ঠক ঠক। কপাল কাঠঠোকরা। খাবারের গন্ধের মতো কটুক্তি ভোলে চেতনা। বাসরের বিস্মৃতি অনেক বেশি মেধাবী।

কানের দুলের দিকে তাকিয়ে ঠিক করা গিটকিরি। দাদা ইতিহাস বলতে পারছে না। সিনেমার কাটপিস দিচ্ছে। গুছিয়ে আনা ব্যাগের মতো উৎকণ্ঠায় ছড়াচ্ছে কাঁচাপাকা চুল। সহাবস্থানটাই জরার লক্ষণ কখনও কখনও। ফিস ফিস। কানের কাছে হেসে হারিয়ে গেল কেউ। আমি চমকে উঠি। কোঁউ। পেখম। গর্ত। কৃষ্ণের বাঁশি মনে পড়ে। বিবাহিতা ময়ূর হয়ে গেছে। ঘাড় হেলে পড়েছে পিছনে। একটা গলি, যার শেষ নেই। ছুট ছুট ছুট। ময়ূর ধরতে বাগানবাড়িতে। দুম। একটা গুলি কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। হকচকিয়ে দাঁড়ানো। একটা গর্ত এসে লেগে রইল পাশের পাথরে অভদ্রের মতো। সামনে বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ।

মুখ ঘুরিয়ে দিতির চোখে সুরমা। জিন্সের টানা সরলরেখায় ফুটে উঠছে শাড়ির পাড়। মেঝেটা দুলে উঠল। সোনা আর সোনা। হলুদ আমার নাকে মুখে ঢুকে পড়ছে উড়ে উড়ে। আমি ভূতের মতো দিতির পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। দিতি আঁচল ওড়নার সমান্তরাল। কাজল উড়িয়ে যায় আমার পাশ দিয়ে। চিনতে পারে না। জৈন মন্দিরের সঙ্গমরত ভাস্কর্যের হাত থেকে হারমোনিয়াম টেনে নিই জোরে। ঘোরা ঘোরা পাথুরে পথের ওপর আমি গাইতে চাই, "ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে..........."! কর্কশ শব্দে আওয়াজ বেরোয়

"কেশরিয়া বালম,পধারো হামারে দেএএএশ"। শব্দবাজি।

দিনটা রাত। আকাশে বাজি ফুটছে তারার মতো। বিবাহিতার বিরক্তি "সোনার কেল্লা শপিং মল"! ঘের কাটিয়ে মানিকের আভায় ঝকঝক করছে। কথা হয়। পরের জন্মে সে হবে সত্যজিৎ। দিতির ওড়নি নিয়ে আমার কাছে ছুটে এল জরিমোড়া এক শরীর। এও তো কম জন্মের নয়! সমাপতনের বেগ বাড়ে। আমার মুখে গোলাপ জলের গন্ধ। চরতে থাকা গরুর নাদায় পা দিয়ে আমি পাশের কড়ি আঙুলে জড়ানো আরেক দিতিকে দেখতে পেলাম। দূর অন্ধকারে এক সাদা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা আসছে এগিয়ে। মাটি টুক টুক হাওয়া। ভেসে আসে। পাথর ছোঁয় না। দিতির মতোই স্পষ্ট তবে বিবাহিতার চোখের মতো ঝাপসা।

দিতি দেয়ালের আড়ালে। আমাদের ঠোঁট। দুইয়ে মিলল তিন। ঘাম জমে ফোঁটা ফোঁটা। দুটো কয়েকশো বছর আগের ঠোঁট। দুটো টাটকা পুরোনো। একটা দুইয়ের মাঝামাঝি। ভাঁজের নামতায় আলস্য। “কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।/ চরন চপল গতি লোচন লেল।।”[11] খস খস করে সরে যায় কিছু। তিনজনের মাঝে ঘনীভূত হয় সন্ধের অন্ধকার। এও এক জন্মসম্মেলনী। ফেলে আসা পত্রিকা। ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা উলটে আসে প্রায়। সময় হেসে উঠল খিলখিল করে। আমার মরুভূমির চোখ মনে পড়ে গেল। রোদ ঘামে। আমার বৃষ্টি পায়। বিবাহিতার জড়ানো কোমরে হাত রেখে মনে হল, এভাবে হাজার হাজার চরিত্র জাতিস্মর হয়। সময় আর রোদের অবাধ শরীরমন তারা পায় না। হলুদের দিনলিপিতে এটুকুই দুই পংক্তির ফারাক। শুধু এক চিলতে প্রেম আর একটা খোলা চিঠি। শুধু একটা...

[11] বিদ্যাপতি

আলোকলেখ্য— স্বয়ং

২৪শে অক্টোবর ২০১৮

বিকেল ৪তে ৮

ওরা ঠিক দাঁড়াতে পারে না, বিবৃত সংবৃত বৃত্তের মতো বহুকাল ঝাপসানো হয়ে আসে

পারবে নীরবে কবি অনশনে গান ঠেলে বিবাহিতা স্খলন ওঠাতে? অক্ষর বড় অক্ষম প্রিয়

এন্ট্রি ৮

উহারা কি...! একটা প্রকাণ্ড কুঁজো মাল দাঁত বার করে ভ্যাঙালো অনেকক্ষণ। বোদমা পাহাড় আর অরক্ষণীয়ার বুকে ঢিল। ভেলভেটের স্বর্গরাজ্য। সফিস্টিকেটেড হলুদ বিস্কুট। ব্যোমকেশ হলে সোনা বার করা যেত। চেরা। বড় পাটালির মতো পা। বালির সঙ্গে তার মল্লযুদ্ধ। কেউ আঁকে বালি মোছে। কেউ কাঁদে বালি মোছে। জল এমনিই বাষ্প ভালোবাসে। জিগ্যেস করে দেখো। দিতি চোখ নাচিয়ে বললে, "কি? এমন করে জড়িয়ে ধরার আর ছুতো পাবে?" আমি হাসি। মরে যাওয়া হাসি। "ছুতো কথাটায় বড্ড ছুঁচো ছুঁচো গন্ধ যে দিতি!" দিতির চোখ ভাসে। দিগন্ত বড় বেশি নগ্ন এখানে। চোখ নামিয়ে বিস্বাদ জবরদখল বলে, "হবেও বা! আমার বড় হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।" বিবাহিতা আমার জামার খুঁট ধরে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে স্থানুর মতো। "কিছু বলবে?" বিবাহিতা সিঁদুর দেখিয়ে বলে, "বলার কথা বলাতে গেলে বলন লাগে, সময় আসে নি যে আজ!" "ও আজ আসবে না। কি একটা রয়েছে বলল গতির বাড়িতে!" কুঁজের চাপে ছড়িয়ে যায় রামায়ণ। আমি কুঁজটাই আঁকড়ে ধরি। বেলি ড্যান্স করতে করতে এগিয়ে চলে বাংলা।

নীচের ধূসরতা চুমু খেয়ে যায় বুকে। পরিচয় নেই। যৌনাঙ্গ নেই। মুখাবয়ব নেই। ক্যাকটাসের মতো সাদা ফুলের কাঁটায় দুঃখের পায়ের পাতা ছিঁড়ে যায়। তবু গন্তব্য কাঁটাতারে আটকায় না। দুঃখ পথিকরাজ। তার ওড়না নেই, আভিজাত্য আছে। বোতাম বলছে আজ কিছু একটা হবে। দিতির চুলের গন্ধে আমি পুরোন গন্ধ পেয়েছি। বাড়ছে। বাড়ছে। বালিতে হাওয়াতে ঢেকে যাচ্ছে পা। আকাশের অবয়বটা একবার কেঁপে উঠল। বালি। খস খস। নিরাবয়ব মূর্ত খোঁজে। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে অতি বৃদ্ধ এক লোলচর্ম জন্ম। একক নয়। একান্তর। ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে দিয়ে সে বাড়িয়ে দিল হাত। আমি শুনলাম যে সূর্যমন্ত্র একদিন কুন্তীর

একান্ত আপন ছিল। "দাও"! নখ দাঁত বার করে ফালাফালা করে দিল আঙুল। দুটো অক্ষর। আমি গর্জে উঠলাম, "কেন দেবো?" এও চিরন্তনী। অহং। কন্দর্পের ভয় আমার আর বিসদৃশ লাগে না। বরং শক্তির দিকে আরো এক পা এগোই আমি। জন্মের একচক্ষু সাদা। নিটোল কীটের মতো সাদা। সে ধিক্কার দেয়। দিতে চায়। হারিয়ে যাবে? যায় না! বহুদিনের বসে থাকা কফের মতো সবুজ প্রসব-যন্ত্রণা। বলে, "যোগ্যতা যতটা বাধে, জোর তার বাইরের ঘাসের লোভ ধরায় প্রতিদিন। দিগন্তের শর্করা রক্ত। একটু নুন না হলে জন্ম জমে না বরখুরদার!" চলে যায়। চলে আসে। চলে গেল গলনাঙ্ক না জেনেই। আমি বোম্বাই ফিল্মের রিলে লেগে থাকা এঁটো নই। ঠোঁট কামড়াই। আর্তনাদ ওঠে না। ওঠে নি কোনোদিন!

বালি? ধুলো বরং। রাখ। খাক। পুরোন রেকর্ড বন্দী বৃষ্টি। "উড় উড়কে কহেগি খাক সনম"! পা বসে যায়। ফল্গুর রূপকথা-বুকে চেরা পায়ের ছাপ রেখে যায় থর। আমি দেখি দুটো পালক লাগানো শিরস্ত্রাণে দুইচোখ কান্না। হাতুড়ি তার সাপের রক্তে হারিয়ে গিয়েছে। দিগন্তের বুকে আগুন ধরিয়ে কাঁচুলি নিয়ে যায় একটা লাল কাপুড়ে বুড়ো। ছুপ ছুপ। ছুপকে। স্কুল পিরিয়ডের মাঝে দরজা দিয়ে উঁকি মারা ছাত্রের মতো। অত্যাচারের অপেক্ষায় থেকেই স্বাধীনতা তারিয়ে খায় চোখ। চোখের নিচে গাড়ির চাকার দাগ। উটের গাড়ি। বাবলা গাছের ছায়ায় রঙ টানে সাদা কুর্তি কুর্তা। জীবনের বৃষ্টি তার চেটে নেওয়া বাকি। দিতি আর আমার মাঝে জন্মের দূরত্ব বাড়ল। আমি আবিষ্কার করি। না করলেও করি। বিবাহিতা এখানে নেই। ছোটবেলার মতো সে মরুর তীরে অপেক্ষা করছে। ছলাৎ ছলাৎ। বাষ্পবোঝাই বৈঠা পড়ে। কেটে আসে গর্ভপাতের ভয়। অলক্ষ্যে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। দরজা নয়। এখানে সবটাই দরজা। ঘরে আসার অনুমতি নেওয়া অভদ্রতা। বুড়ো হাড়ের কড়া। সোনার ডাঁইয়ে চাপা

পড়ে ছটফট করছে। ঐ এক ডাল। ঝুঁকে আছে প্রশ্নে। এতক্ষণে চোখে পড়ে। একটা দড়ি ঝোলে। বাঞ্জারার লাশ হয় না। কাফনের মশাল ধিকি ধিকি ধিকি। দড়িতে দোল খায় দিতি। নীলকণ্ঠি। টুপ টুপ। কষ বেয়ে লাল। বালির সংকর্ষণ বাড়ে। আঠার মতো প্রযুক্তি লেগে থাকে ঠিক নীচটায়। বাড়ানো পিচের রাস্তার মতো জিভ তার। কয়েকটা আফ্রোদিতে ভন ভন করছে প্রযুক্তির জিভের চারপাশে ক্রমাগত। দিতির ছায়াটা দীর্ঘ হয়ে আমার জুতোয়। পা হড়কে বালিয়াড়ির গোড়ায়। ধুলোর রঙ লাগল ক্যানভাসে। ওলটানো চোখ জরির পাড় বেয়ে প্রশ্ন করে, "আসবে তো?" আমার প্রায় নুয়ে আসা বাঁশিকৃত বোধ জোব্বার সুরে বলে,

"...সখী সীদতি তব বিরহে বনমালী।।

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি।।

ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজুমপযাতি।।"[12]

[12] জয়দেব

একা একটা ইজেল। টুল ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্যানভাসের ক্লিভেজ অবধি হাওয়া। চোখের পর্দা। সরে না। সোঁ সোঁ শব্দে পুরো দৃশ্যটা কোনাকুনি খুলে গেল। পায়ের কাছে। পিছনে ধুলোর ঝড়। ধাক্কায় ফিরিয়ে দিচ্ছে অন্তরাল। হাতের দেয়াল টপকে যতটুকু আলো। পাঞ্জা মারা। এগিয়ে চললাম। কে যেন 'চেনা'-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হারিয়ে গেছিল। এগোনোটা পওরওস আর পেনিয়ার ফুলশয্যায় শেষ হয়েছে চিরটাকাল। সানসেট পয়েন্ট। ঝোপঝুপে খ্যণ্ডার। গরুর গলার কাছে কাঁপছে চামড়া। আমিও ধূসর। পা বলে, "কখনও তো এলেনা মেঘে!" আমার চোখের পাতায় তুলি। রঙ করে দেব ভেবে তাকাই। দেখি পা আমায় ছেড়ে মরুভূমির ঘরে গিয়ে উঠেছে কত জন্ম আগে। চশমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিবাহিতা দীঘল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার পর রোদ বেয়ে এগিয়ে যায় উদ্দামতার ছায়ায়।

এমন কিছু বিন্দু। এমন কিছু অসমতল। এখানে আপতিক শব্দার্থ বসে সাদায় মোড়া বৃদ্ধ সেজে। কখনও কখনও আমিও আসি। বহুজন্ম। কেন আসি? বিড়ির আগুনে উন্মাদনা। ধীরে ধীরে ধূসরতায় ডুবে যায় বাস্তব। অপেক্ষায় আছি আমরা। পা দুটো হারিয়ে গেছে। আমি একটু আঙুল সেঁকি। উটের পিঠ থেকে থরে যদি বিবাহিতার সিঁদুরে মেঘ আসে। পা আমার বাড়ি আসবে। ঠিক আসবে। বুড়ো আঙুল অবধি ঘোমটা টেনে। এখন রোদ চাইনা। স্বার্থপর বুড়োর চোখ আর যৌবনের উদ্দামতা ভাষা পেতে একটা মরুভূমির সূর্যাস্ত লাগে। একটা সম্পূর্ণ সূর্যাস্ত...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৫শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ৯টা ৪৩

ক্লান্ত অবধূতের জমিন দেখেছ কোনওদিন? বিবাহিতা তার সন্দর্ভক্রান্তি বিস্মৃতির তলায় জবান-বন্দী গুনগুন

দিগন্তেরা ফিরতি পথে বাড়ির আনাজ ছোঁয়। কে কার দ্রাঘিমায় বল অপেক্ষার শীতলতা ঢালে!

এন্ট্রি ৯

কালকের উড়ে যাওয়া পাতা আজকের জানলায় উড়ে আসে কখনও সখনও। ঢুকতে পায় না। জমি গুছিয়ে রেখেছে গরাদ। কেউ ডাল কেটে রেখে গেছে। হলুদ পাতা। সোনালী দুপুর বাসের চাকায় সন্ধের তেল হয়ে নামে। বাড়তিতে প্রদীপ। আকাশে মেঘের চিলেকোঠায় কোঠা সাজিয়ে বসেছে বুড়ো বাইজি। তার কাছে দাবি নিয়ে আসে না অদিতি। দিতির নখে অন্ধকার ছিঁড়ে এসেছিল কখনও। ফুটিফাটা চাদর। ঝুরি ঝুরি। সুতোয় ফসল লেখা থাকে। চোখ চলে না। বুক চলে না। শনের মতো চুলের বাইরে ঘোলা ঘোলা যন্ত্রণা। শরীরে নখের দাগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। অবসর। টানতে থাকে। কোলের শিশুর মতো চুম্বক আঙুল তার। বৃদ্ধার গর্বের দিন। আনন্দের স্মৃতি। আজ চাঁদোয়ায় চাঁদ বসে না। শিকলের মরচে একা একা দাগ কাটে ঝরে আসা খাঁচার উপরে। বসার বয়স। তবু পায়ে আড়মোড়া ভাঙে। এক দুই তিন। ঠাঁই দাঁড়িয়ে পা কনকন। পরশুর ফেলে যাওয়া নাড়ু। একটু বাসি রঙ ধরেছে। তিনপায়ের চোখে পড়ল। ঝপঝপ। বিবাহিতা শিউরে উঠে আমার পিঠে চিমটি দিল।

"করুণ চিলের মতো সারাদিন ঘুরি
ব্যথিত সময় যায় শরীর আর্তনাদে, যায়
জ্যোৎস্নার অনুনয়; হায়, এই আহার্যসন্ধান।
অপরের প্রেমিকার মতন সুদূর নীহারিকা,

গাঢ় নির্নিমেষ চাঁদ, আমাদের আবশ্যক সুখ।”[13]

রোদের পায়ের ছাপটুকু জড়িয়ে বালি সরে গেল। আমি নেমে গেলাম বেশ খানিকটা। ধুলোর ঝড় এখন পড়ো পড়ো। বাষ্পের দেয়াল। সমাজ বলে,"ধুলো মানেই রাস্তা।" এতবড় পায়ের পাতা নেই তার। থেকে থেকেই সূর্য দেখতে গিয়ে চাঁদ দেখে ফেলাটা দোষের নয়। তবে চাঁদের কাছে তেল টেল চাওয়াটা......। মরুভূমির ওপর দিয়ে মেঘেদের ওভারব্রিজ দিয়ে একবার দিতির খবর নিতে আমাকে যেতেই হবে চেতকের পিঠে। পায়ের মান ভাঙাতে। তৃতীয় পায়ে গতি পায় জীবনের আবহ। লেংচে লেংচে। কে? রোদের মুখ ভার। বলে, “ক্ষয় ক্ষয়। যক্ষার ওপার থেকে আজ একটা গাংচিল এসেছিল। চোখের আওয়াজে ঠোঁট ফুটে যায়, “নামতা শোনার স্বপ্ন এখনও দূর ভাই! কুচকাওয়াজের প্রতিজ্ঞায় ঘুঙুর পরিয়ে গেল কেউ। এবার তো এগোতেই হবে!” রোদ পায়ের কাছে বসলে হাঁটু গেড়ে। বললে, “তা হবে। হলে কিন্তু গাল দিবিনে বলে রাখলুম!” “জবরদখলে গাল খেতে অভ্যস্ত হ ভাই, ওরকম অর্ধচন্দ্র দিলেই তবে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা আসে।” কিছু বললে না। বলার ঝুলি উপুড়। ঘুঁটেকুড়ানিয়া মৃদু আলতায় যায়। যায়। যায়। যেতেই থাকে।

বুড়ির কোঠায় পাথর কোঁদা নকশা। কাশির সারেঙ্গীতে ঝঙ্কার ওঠে। একটু গুছিয়ে নিতে চায়। বোধহয় সময় এল। উঁচু ঢিপ নক্সার চৌর্যবৃত্তি দূর থেকে মহলের মতো লাগে। হোলির দিনে সিঁদুরে জোৎস্না। আলপনাদিকে রঙ্গে আঁকতে গিয়ে বিদ্যুৎ। ভেজা পাহাড়ের উপরে ওপর দিয়ে আমি নমনীয়তা ঢেলে দিচ্ছিলাম। আলপনাদি তাকিয়েছিল। গলিয়ে দেওয়ার মতো বিচ্ছুরণ। আরামের আশ্বাস।

---

[13] বিনয় মজুমদার

আদরের হাতেখড়ি প্রকৃতির অসীম ব্ল্যাকবোর্ডে। অথচ হিসাবের খাতায় তখনও গেরোর বাঁধুনি পড়েনি। “এই!” সময় আমার জামাটা আলতো একটু টানে। সোজা করে। ভুরুর ঢেউ। আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না। নিজেকে দেখতে একজোড়া মরা চোখ লাগে। আমার চোখ ধূসর এখন। মরা ছাগলের মতো ঘোলাটে। সময় নাকে নাক ঠেকায় এগিয়ে। বলে, "এই টিপটা দেখেছ? কেমন লাগছে গো? মৃত্যুর কাছাকাছি হতে পেরেছি বলো!" আমি বললাম,"টিপে ভানুসিংহ ছুঁলে, নিজেকে গঠন করার ক্ষুদ্রতা থাকা চাই। তোমার অস্তিত্বই যে ক্ষয়ে!" নাকের পাটা ফুলে উঠল। বুর্জোয়া দাঁতে শোষিত হল অধর। একগাছি চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম কপাল থেকে ওর।

বুড়ির সিঁথিতে সিঁদুর। আমি জানি ওর বিয়ে হয় নি। দুরু দুরু। ঝুলে এসেছে ছন্দ। প্রশস্ত রাজপথ। ঐ লাল পথ অপেক্ষার। দিগন্তের নক্সীকাঁথায় ছলকে ওঠে সুতো। ফাঁসে লেগে থাকে দিতির মতো মৃতদেহ। সন্ধ্যাসঙ্গীত। পোড়া চুলের পোড়া মন। ছলনা তার এখনও ফেরেনি বাড়ি। চুলের শরীরের ভাঁজে জড়িয়ে থাকে সর্ষেফুলের কানের। হাতের ছাপে দাসখত। ভাঙা পথের ধুলোর নিবেদন। নিবেদিতা সবার অলক্ষ্যে প্রণাম করে। নিজের শয্যাকে। আকাশ তার চাদরে ঢাকে মুখ। রক্তে ভেজা রাণুর বুকে সমস্ত রাত্রি জেগে থাকেন ওকাম্পো। অন্য প্রেমিকের বার্তা। আমি এগিয়ে চলি একলা। পায়ের মান ভাঙে। এ সূর্যাস্তের সাক্ষী থাকে কোজাগরী। রক্তপথ ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো চকচক করে। চখার চোখে চাখার চাঞ্চল্য। সাতসমুদ্র পাহাড় পেরিয়ে এসেছে বালি। ডানা। কাঁথা ছুঁড়ে মারতে এখন ভুলেছে বাঈজী। পিল পিল পিল পিল। ধুনুচি নাচ। রাজার সৈনিকেরা এখন দক্ষিণারঞ্জন ছেড়ে সরকারী খালাসিটোলায়।

“আসুন, আমরা আর একটা পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি বাসপোযোগী মানুষ সে আর একটি প্রাণহীন তাপদগ্ধ সৌরগ্রহে অবৈধ মুদ্রা-ধার অভিযানের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এবং ভালোবাসাহীন মানুষ কোনোকালে চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে না।”[14]

একটাই স্বপ্ন। দিতির কষ বেয়ে আসা রক্তের আপতনে আমি শব্দ ছুঁড়ব না। লালকমল নীলকমলের সুরে একটা পাঁচালি কাটব। বিবাহিতা রূপকথা ভাববে। সময় রূপকথা ভাববে। সবাই রূপকথা ভাববে। আসল কথাটা মরুভূমির বালিতে পা পেড়ে বসে আমি আর নচিকেতা ঘোষ আলোচনা করব আখেরনের কাছাকাছি আরেকদিন। এমনই সোনালী জোৎস্নায় ভেসে যাবে দিতির লাশ, আর খানিকটা কাম্য নিস্তব্ধতা...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৫শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ১১টা ১৫

---

14 শৈলেশ্বর ঘোষ

বলতা সময়ের গয়নালি তানপুরা মাটি, ধাপ গোনে যতদূর হাতির দাঁতের হাতিথাম, অস্থি সে অস্তি জানে না

লালচোলি পালিকার নগর কাঙালি সতী শুন সর্ব্বোজনে, এমন ঘাটের পারে কদম্ব ফুল কিছু কুড়াইয়া নিও

এন্ট্রি ১০

ফাঁসিকাঠ। আলপনাদির কুয়োটা প্রিয় ছিল খুব। মিষ্টি জল। হাত দিলে ছবাং করে আপত্তি করত ভরে আসা বুকের মতো। জেলারের রুলারেও মাথা ফেটে রক্ত আসে। সমাজ তাকে সিঁদুর চাপা দিয়ে হত্যা করে আচম্বিতে। ব্যঙ্গ তখন বেরিয়ে আসা জিভে। দিতি দিতি দিতি। দৈত্য তাকে ছিনিয়ে নিতে জন্ম পাঠিয়ে ছিল। আলপনার মুছে যাওয়াটা কারোর চোখে পড়েনা কোনোদিন। কাদম্বরীর মৃত্যুচেতনাকে সূর্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তির পিক ফেলে বিচারক। চাবুক চলে। গুনতি। বেনারসীকে আমার সেদিন থেকেই ব্যান্ডেজ মনে হয়। থির থির। মেঘের বুকে কাঁপে সূর্য। পর্দা টাঙানো। ধোঁয়া ওঠে। আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে জল্লাদ। গোঁফের টুবো টুবো কালি যাপন করে পটের ভূমিকা। উপসংহারের প্রতীক্ষা-রতা ঘুনসি। কেউ দোলে। আমার কাঁধে মাথা রাখে সময়। ক্লান্ত চোখ। হাতে ধরা শব্দের শবদেহ তখনও তরতাজা। নিজেকে প্রবোধ দিতেই হয়ত আলপনাদির চোখ দুটো মুঠো থেকে বের করে আনি---

“আমার রক্তের মধ্যে লোহিত কণার মতো মিশে আছে

গণিকার ঠোঁটের লিপস্টিক, ধবল শঙ্খের দাঁত খুলে খুলে

সাজানো চুম্বন। কোনও ব্যাধি আমাকে ছোঁবে না।

আমি এই শতাব্দীর গণঘৃণ্য রোগের সন্তান,

কোনো পাপ আমাকে ছোঁবে না।

আমার হাতের মধ্যে স্বেচ্ছায় খুলে-দেয়া

বেশ্যার রাজদ্রোহী স্তনের গর্জন, কোলাহল,

কোনো শৃঙ্খল আমাকে ছোঁবে না।

আমার কণ্ঠের হাড়ে অহংকারী যুবতীর খোঁপার শেফালি,

মৃত্যুমাখা নীল-পাট আমাকে ছোঁবে না।

আমার মাংসের মধ্যে লাল ঘুণপোকা,

ছিন্ন পেশী কণা, কোনো প্রেম আমাকে ছোঁবে না।

সমস্ত ফাঁসির রজ্জু জ্বলে যাবে প্রচুম্বিত কণ্ঠনালী ছুঁয়ে,

ছিঁড়ে যাবে বেদনার ভারে। মৃত্যুদণ্ড আমাকে ছোঁবে না;

কোনো শৃঙ্খল আমাকে ছোঁবে না।"[15]

বিধবা হল মরুভূমি। ক্লান্ত দিগাঙ্গনার বুকের কাপড় পড়ল খসে। ড্রপসিন। মুখ নামিয়ে হাততালি। চটাপট চটাপট। নিভে গেল মেঘ। পা ভারী হচ্ছে ক্রমশ। শোক নয়। স্বার্থপরতা। ঝোঁক। মরুভূমি ফিরিয়ে দিলে মরুদ্যানে আশ্রয় নিতে হয়। অগত্যা। গুড়ুক গুড়ুক। হুঁকোর শব্দ। একটু ধোঁয়ার আশ্রয়। টোলট্যাক্সের রাস্তা শেষ পর্যন্ত আলেয়া হাতেই জলের দিকে ছোটে। সাদা কাপড়। মুখ ঢাকে রঙ্গ। একটা উঁচু স্ট্রীটলাইট। তার নীচে পরিখার ভাষার স্কুল। তাবু। ঝিল দিচ্ছে বিদ্যুৎ। বিবাহিতা দ্বারের কাছে। একা ঢুকতে সাহস পায় না। শিকড়ে যখন অবাধ হাওয়া তখন চণ্ডীদাস মেলে ধরে কাঁটা। তার সবটুকু আবেদন ঢেলে। "মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।/ দ্বিগুন আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে।।"[16] মাটিতে পাতা গদি। তাত ছম তাতা ছম। ঘাঘরা কাঁপে। ঘাঘরা জপে চরণ-ধূলার নিভৃত অনুদান। কে জানে! কে জানত? সময়ের পাশে অন্তরঙ্গরাও গন্তব্য হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন বা নির্বাসনকে জিগ্যেস করে দেখো! চিঠির আদল তার কত কাছাকাছি!

দ্রিমি দ্রিমি। হারমোনিয়ামের বাইরে গলা। স্কচের গ্লাসে তানের কম্পাঙ্ক। বুকে আসে মাথুর। পর্ব আসলে প্রকোষ্ঠ। রক্ত এলে বাড়ে, গেলে কমে। জয়দেব জানতেন। আমার হাত ধরে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল ছায়া। মৃতদেহের ভিড়ে। রঙ। খালি গলা। বুক জ্বলে। আমি নাচের পোষাক পাই নি কখনও। ছিটে ফোঁটা। কুমারসম্ভবের আটে আমি আটকে পড়ি। পাথুরে দেয়াল। গলায় ব্যথা। সুরার পর সঙ্গমের

[15] নির্মলেন্দু গুণ

[16] চণ্ডীদাস

তীব্রতা থাকে না। কালিদাস জানতেন না কি? চোখ ঝলসে ওঠে হঠাৎ। অহল্যা আমার থেকে অনেকটা দূরে বসেছে। প্রকাণ্ড একটা গাছের কাণ্ডে অনেক গুলো মুখ। নড়ছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না। শুধু মুখোশটা দেখতে পাচ্ছি। বসে বসে ঘোরে। জামায় আগুন। মুখে আগুন। তাই কৃষ্ণ? একটা নীলকুর্তি কৃষ্ণবদন আগুন ছোঁড়ে। ড্রাগনের দক্ষতায়। আমি জ্বালানির বোতলটা দপ করে ধরে ফেলি। আগুন গোঙায়। ছটফট করে। ঘূর্ণি লাগে। লেগেছে। নীলের সঙ্গে হলুদের ভাব হচ্ছে খুব। বিবাহিতার পায়ের আঙুল নিভৃতে চাপ দেয়। আমি ওর বুকের জড়ত্ব মাপি। আঘ্রাণে। আখেরনের তীরে।

অপ্সরা আখেরনের মরুদ্যানের দ্বারী। আনুবিস ওর পায়ের কাছে গুটিসুটি পড়ে থাকে। ঝাপসা হতে থাকে অনুবীক্ষণ। হিমালয়ের গল্প বলি আমি অপ্সরাকে। সে উত্তর দেয় না। তার শরীরে তাল পড়ে মৃদু। ওকে ছোরাটা দেখাই। কালো ধারের ওপরে চকচকে একটা বিন্দু। বাতাস ফোঁস করে ওঠে। ঈর্ষায় কাতর হয়ে বলে ওঠে ছায়া,"কিছুটা আমার চূড়ায় রেখো!" অপ্সরা বলে,"আমি পুরোটাই তোমার, ছায়া! নাচনেওয়ালীর ছায়া হয় না।" আমি অলকানন্দার জল আনি। টল টলে। বৃত্ত ঢেউ। তাতে দিতি আর আমার প্রতিবিম্ব। না-বাঁধানো। অনামিকা ছাদের নেশায় শরীরের মন ছোঁয়ার মতো। বিবাহিতা আড়চোখে তাকায়। লাস্য লালার মতো অচেতনে গড়ায়। আমার আফসোস। ইন্দ্রজাল। তাসের দান শিখতে পারতাম আগে। অপ্সরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। অন্ধকারে জোনাকি। কৃষ্ণ অপলক তাকিয়ে আছে এদিকে।

অপ্সরা তার ঘাঘরা ছড়িয়ে বসেছে চারিদিকে। কাঁচপোকা সেখানে বসে রোজ। কাঁকড়াবিছে। মাথা নীচু। ঝুমঝুমি সাপ কুণ্ডলী শানায়। আরাম একটু সরে। আমার পাশাপাশি। বসার বেদীটা ভেঙে যায়। একটা ঘেঁটুর গাছ। পাড়তে গিয়ে থমকে থাকি। মৃণালিনীর কথা মনে

পড়ে। মৃণালিনী ঘোষাল। “......এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব/ ভাসিতেছে চিরদিনঃ নীল লাল রূপোলি নীরব।”[17] আমি চোখ তুলতেই একটা বাচ্চা অভাবের একটা থালা দিয়ে গেল। এই রঙটা! আমি বালিয়াড়ির কথা তুললাম। অপ্সরা এক চোখ ক্লান্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। ও কি বুঝল তবে কুমারসম্ভবের ভ্রান্তি? দ্বার তবে কি খুলবে না শাক্তে?

আমি এদিক ওদিক পা ফেলতে ফেলতে বাসে ফিরি। নরম অশান্তিতে গোড়ালি ডুবছে। বিধবার শাড়ির পাড়ে বিবাহিতার সিঁদুর। কখন অলক্ষ্যে......। টানা গোলোকধাঁধাঁ। সংক্ষুব্ধ আরম্ভের গতি। গলির রাজ্য পেরিয়ে এসেছি। প্রকাশ্যের আওতায় বিবেক অশ্লীল। আকাশের একদিকে চাপ চাপ মনখারাপ। ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যাপত্য- “নয়ন কাজর তুঅ অধর চোরাওল/ নয়নে চোরাওল রাগে।/ বদন বসন অব লুকাওব কতিখন/ তিলাএক কৈতব লাগে।।”[18] ঝিরিঝিরি। সোঁদা গন্ধ। অপেক্ষা থেকে প্রতীক্ষার মধ্যবর্তী ধারা। ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ। ছুটতে ছুটতে এসে বাসের সিঁড়িতে পা দিয়েছি সবে, কেউ ধাক্কা দিয়ে বালির ওপর ফেলে দিলে। ব্যস্ত হওয়ার আগেই ঠোঁট ডুবে গেল ঠোঁটে। কাঁচের চুড়ির বোলে কপালে রক্তের তান ফুটল। গালিচার ডুবে গেল সন্দেহ। তবু! সীমানা ওটুকুই। দেয়াল টপকে দেখা একবার। এক মুহূর্ত। ব্যাস। অতঃপর অন্ধকার ভেজা শীতলতা।

হাতে একটা গোটা রাত ধরিয়ে দিল অপ্সরা। পুড়তে অবসর দিল। হালকা বৃষ্টি। এভাবেই ঝড়ের রাতে একে একে পেরিয়ে আসে স্বপ্নেরা। আরো বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া। দিতির কাছাকাছি। ড্রপসিনের ওপরের লাল আলোটা জ্বলে উঠল তখনি। ঠিক তখনি...

---

17 জীবনানন্দ

18 বিদ্যাপতি

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৫শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ১২টা ৩৩

হাজার বছর বড় ব্যর্থ সময় বলে লতা তার ফুল ফল গর্ভাশয়া সব নিয়ে চিক পেতেছিল, গহীন শ্বাপদ-পিঠে

বস্ত্রে অবস্ত্রে দিও তনু চূড়া আবরে / মনেরও আবর রাধে কোথানু পোহাবে? আগুনালি রাতকণা সব পিয়ে যাবে

এন্ট্রি ১১

ক্লিশ ক্লিশ ক্লিশ। মুখের ওপর ওপর জল দিলে চোখের ভেতর ভেসে ওঠে বায়োস্কোপ। টিং টিং টিং টিং। একটা সাইকেল। জাব্দা ক্যারিয়ারে বসানো বিশ্বকর্মা। রথের মেলা রথের মেলা বসেছে রথতলায়- গেয়ে ওঠেন সনৎ। একে একে পাল্টে যায় স্টিল শট। ক্যাঁচ ক্রোঁওওওও। অতীতের রিল গোটানোর শব্দ। জামার ভেতরে হানা দেয় কখনও সখনও। আওয়াজ ওঠে। আওয়াআআআআআজ। শব্দ। শব্দ আসলে কি? ধুকপুক ধুকপুক। নিজের হৃৎপিন্ড ধুলোয়। চশমার ফাঁকের গিলোটিন। ছাদে খোঁজে। মোড়ার তলায় খোঁজে। হিপ পকেটে খোঁজে। খুঁজে খুঁজে খুঁজে খুঁজে খুঁজে সারা। ভ্যাঁচর ভোঁচর। একটা জং ধরা সাবেকি সড়কি। ঠনঠন করে পেরিয়ে গেল একটা ছ্যাকরা গাড়ি। লন্ঠনের কাঁচা হলুদ রোশনাই দেয়। দোকান আছে। পাছাপেড়ে শাড়ি পরে বসে থাকে। ষোড়শী। জীবানন্দের আশায়। ছড়ানো কোলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে নিষ্ঠুর দেড় ফুট। আমার অবাক লাগে। সব্জির ঠ্যালাগাড়ি মাতৃস্তন্য ফেরি করে আজকাল! এভাবেই ছ্যাকরা গাড়ি ল্যাম্বারগিনি হয়, শুধু লন্ঠনের কাজলকালি বদলায় না। ফঁস্স্স্স্সঁ। অদৃশ্য কাউকে শাসায় ঘোড়া। স্স্সাক। কড়ার চাবুক। ভেতরের বাষ্পে কাঁচ জোড়া অবধূতের নিঃশ্বাস। জটার প্রসন্নতা। ধুলোয় শুয়ে থাকা হৃৎপিণ্ড আশ্বাস পায়। তারপর কলমের ডগায় সড়কির প্রত্যাগমন। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে আনে শেষ রক্তবিন্দু। লক্ষ্মীর আলপনায় নৌকো ভাসে খেরনের। আর্তনাদ সর্বোচ্চ শব্দ। ও ছাড়া ভাষার দশমী। একটা শকুনের পালক কুড়িয়ে নিই আমি। শবদেহে শব্দের জানাজা। শ্মশানের দোসর নদী আর কে আছে? পাশে তো সবাই থাকে একাকীত্বের বোঝা নিয়ে!

বিবাহিতা আর সময়ের ব্যাকুলতা রেখে আসি তীরে। দিতির টানে আখেরনের খেয়া। মৃদুল মন্দারে আমি নৌকো চাপি। একা নৌকো, খালি। কেউ কোথাও নেই। কুয়াশা আসে। সরে যায় মৃতের বার্তা নিয়ে। বাতি নেই। কালো বোরখার মতো অশিষ্টতা আমার চুলের ফাঁকে ফাঁকে। ছইয়ে হামা দেয় মাকড়সা। কেমন যেন বালতির প্রয়োজন। ছলাৎ ছল। অভিমানিনী। সতর্কতা খই-এর মতো ছড়ায় হাওয়া। আমার কণ্ঠনালী দাতাকর্ণ আজ। অনেকটা রক্ত। অনেকটা। দাম মিটানোর শব্দ করে বিলকাটানি। কেউ মানে। কেউ অর্ধভুক্ত থাকে। বাদুড়ের ডানার সঙ্গে আমি পুরুষাঙ্গের মিল পাই বরাবর। জেগে ওঠে সমুদ্র। চরাচর জুড়ে ফেনা। তার নীচে শিরার থেকে উপশিরার হয়ে শিকড়ের জাল। সোঁদা গন্ধ। ঘামে চিক চিক করে। উত্থিত কালো রাজদণ্ড। মুকুটে বিপ্লব। বড় বেশি শুকনো। অপেক্ষা করে। বেলনা দিয়ে বেলে ওটাকেই পরে থাকে। সুঁচালো দাঁতে আহ্বানের অধিকার। আকাশের কৃষ্ণ গহ্বরে মিলাতে চায় এক হয়ে। ইচ্ছার ওপরে দরদাম নেই। টুপ করে ঝরে পড়ে বকুলফুল।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি। ছোঁয়ালেই ঘুমের জোৎস্না। পৃথিবীর সব ছাদ তখন এপাইরাস। মরণের পারে এসে ভিড়ল খেয়া। দ্রিমি দ্রুম দ্রাম দিম। কেঁপে কেঁপে উঠছে বাডওয়িজ়ারের বোতল। দৈত্য দৈত্য। মন্ত্রোচ্চারণ। শিরার জটিলতা আমার চোখের তারা স্পর্শ করল। প্রশস্ত রাস্তার অপ্রশস্ত বুক। বুকের কাছাকাছি এক কিন্নরী। আঙুলের ভাঁজে তার শূন্যতার বেলুন। রামধনুর সুদের কারবার। ধারি জোনাকি জ্বলছে সেই শূন্যতায়। আমি দাঁড়ালাম। দৈত্যেদর্শনের কর চাই। কিন্নরী তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। বিক্রিবাটায় তার মন নেই মোটে। মধুসূদনের তারার চিঠি মন আলোকবৃত্তে নামিয়ে রাখল। প্রেক্ষাগৃহের রেশ। জীবনের থেকে একটা পোড়া সুতো ঝুলে থাকে সেখানে। ভার্জিলের পাথর ঠেলায় লজ্জা পেয়ে মাটি নিজেই সরে যায়। উঠে আসে চেতনায় শোষিত নাঙ্গাপুঙ্গা একদল আসল অবয়ব। তাদের দেখে দুহাতে রঙচঙে মুখোস খামচে চিৎকার করে ওঠে চেতনা। "বহুরূপী বহুরুপী বহুরুপী বহুরুপী বহুরূপী"—

বহুবার। থেকে থেকে। প্রতি কেল্লার দেয়ালে তার গন্ধ লেগে থাকে। বহুদিন। বহুজন্ম।

কিন্নরী আমাকে হাতছানি দিল। তার গোটা শরীর মেনে নিয়েছে স্বচ্ছতা। পা পা। একটু খানি কাছে। এবার জুতো আটকে রইল নোনায়। শরীর টানছে স্তব্ধতা। একটু একটু করে। ঝড়ের মতো শরীরহীনা লু বইছে। কেদার রাগে কেঁদে উঠল অন্ধকার। অপর প্রান্ত থেকে। কিন্নরীর স্বর ভাসে, "এনেছ?" আমার ঘাড় প্রয়োজনের থেকেও বেশি কাত হয়। "এনেছি।" বাড়িয়ে দিই অক্লান্ত দ্বিধা। কিন্নরী হাতের মুঠোয় দলে তাকে ব্রহ্ম বানিয়ে ফেলে। কাছাকাছি। তারপর বলে, "এস। আমার যেখানে শেষ সেখানে স্রোতের রাজ্য শুরু। পারা না পারার প্রশ্ন নেই। শুধু খোদাই করা আছে। ঘটমান।" আমার চোখ নিজের অজান্তেই কি চকচক করেছিল একটুও? "তবে যে লোকে বলে তোমার নাম সুজাতা? তুমিই নাকি সুখী সব চেয়ে?" কিন্নরী এবার আমার কৃষ্ণগহ্বরে তূণ নামিয়ে রাখল। নোঙ্গরের খাঁজে উঠে এল অহং-এর টুকরো। আমি দেখলাম নগ্ন তিরস্কারের হাসি। কিন্নরী ঠোঁটে চকচক করছে ছিন্নতা। বললে, "বেলুনয়ালীর সঙ্গে তামাশা করতে নেই সাহাব, তাতে রঙের অভিশাপ লাগে!" অভিশাপের কাছে আশীর্বাদের নেশা কতটুকু? দিতি জানে। বিবাহিতা জানে। অনুসরন। আমি এগিয়ে চললাম শূন্যতার পিছু পিছু। খস খস। নিমের পাতারা ঝগড়া করছে। যেখানে দিগন্ত নেই তাকেই বোধহয় অন্দরমহল বলে।

জেয়সলমীর। পাতাল উঠে আসছে পাতলা কুয়াশার মতো এই ছাদে। আমার সরণের হিসাব রাখছে নোনা। দূর দৃষ্টি এক মহলের ওপর। কিন্নরীর আঁচলের অমোঘতাই নাবিক। সে মহলের উপরে রূপোলী ঝুরি নেমে আসছে মেঘ থেকে। এক বৃদ্ধ। চারটে মোট। বাহনের অপেক্ষায়। আমার বস্তিতে জলের লাইনের প্রতীক্ষাও ঠিক এরকম। প্রেমে জলে চিরকাল যেখানে মিশ খেয়ে এসেছে পলাশ

গাছ সেখানে আপনি জন্মায়। পলাশের ফল ডুব দেয় আলগোছে রেখে যাওয়া কোনো হাঁড়িয়ার পাত্রে। আমার বাদুড়মারার চুলে বিলি কেটে বয়ে যায় অজয়। সেখানেও কারোর প্রেমিকা এরকম প্রতীক্ষায় থেকে এসেছে চিরকাল। গব গব গব। কলসী ভরে নেয় কিছুটা শূন্যতা। আলোয়ান চড়িয়ে ব্রিজটাকে ঢেকে রাখে কেউ। অনেক দিনের পুরোন নেশার মতো। সবটাই পুঁজি। ভাঙ্গিয়ে বাঁচার পথে একলা শোষিতা পড়ে থাকে মুখ ঢেকে। চর বেদনার ছাই ভস্ম মেখে চিকচিক করে ওঠে। জ্যোৎস্না নিতে চায়না অজয়। তাই ফিরিয়ে দেওয়ার আগে একবার হাসে।

“সারাদিন আলোর তরঙ্গ থেকে ধ্বনি জাগেঃ

দূরে যাও।

সারারাত্রি অন্ধকার কানে কানে মন্ত্র দেয়ঃ

দূরে যাও।

“তোমরা কেউ কি

উন্মাদের মতো ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছ স্মৃতির অতলে?”[19]

[19] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ধূপের গাঢ়ত্ব ধোঁয়ার আবেশ কতটুকুই বা ধরতে পারে! মুঠো খুললেই ছোঁ। ঝাপসা ঘনায় ঘোর। আমার তরলের নেশা তরলীকৃত চাঁদ গোনার চেষ্টা করে। একটা বিরাট বালি-মাঠের সীমানা এ। রাত কেটে দিন। টিপের করাত। কে এনে দেয়? কেন? আকাশে রূপোর থালার কোন ধরে পায়চারি করছে একটা চিল। অন্ধকারে বাদুড় ধরছে কি? অথবা পেঁচার সাথে বচসার হাটে। টুপি ছেঁড়া অজয় মনে পড়ে আবার। মরুভূমির বুকে। পাথরের এস্কেলেটরে। ঘটাং ঘটাং। এ সীমানায় একটা ফাঁকা সিংহদ্বার আছে। ঠাঁই একা। পাঁচিলের ঘোমটা পর্যন্ত নেই। আনন্দের ভারী জং ধরা বিরাট দরজা খুলে গেল। কিন্নরী পিছন ফিরল এবার। দুলে উঠল তার পাছাঢাকা চুল। আহা! অজয় যদি ওকে ভালবাসত! আমি অজয়ের শরীরের ওপর নিজেকে দেখতাম একবার। অন্ধকারে মেজে ঘষে। হয়ত পরিষ্কারও একটা বৃত্তি। জোৎস্না-স্কলারদের জন্যে তোলা থাকে! জলের স্রোত। স্রোতের কাছে বন্ধক ভাঙানি। ভাঙতে গেলেই উষ্ণ প্রস্রবণ। কিন্নরীর হাতে তুলে দিলাম অন্ধত্ব। একটু ঝুঁকে সেলাম করল সে। সেই নোনার রাস্তায় দোকানটুকুর নিঃসঙ্গতা ঢেকে নিল তাকে। আমি আমার খালি পায়ের অভিমান আর মধ্যবিত্ত জটিলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজায়। মুখ থেকে ঠোঁট। ঠোঁট কেটে চোখ।

এখানে এসে প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব একবার দীর্ঘশ্বাস মাপে। ঢুলুঢুলু শব্দে। স্রোতের কাছাকাছি...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৬শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ১১টা ২৭

পক্ষীরাজের অ-ডানালীন একটা বিকেল-চিকুর ছায়া আমাকে কবর থেকে জ্যোৎস্না তুলতে পাঠিয়েছে সেদিনও

গগন দ্যোতনাহারা বদন তোমার সখী, কালো তিলে আলোকিত নাভিতলে বিধুআঁখি

এন্ট্রি ১২

“স্বপ্নের বদলে এইসব জীবাশ্মপ্রস্তরের মহাকাব্য মহাকালের

ঝঞ্ঝানাচন মারণযজ্ঞ কাল থেকে কালান্তরে রেখে যাওয়া মমি প্যাপিরাস

মেসোপটেমিয়ার

পাথর কুঠার

গয়নাগাঁটি

দেখে নেওয়া যাক হে নিয়তি তো সময় থেকে

সময়ান্তরের মাটি আর ছাই

ছাইচাপা শূন্যতা

মরারক্ত

দুঃস্বপ্নে দেখে নেওয়া যাক স্বপ্নকামী মানুষের দ্বিচারিতা আর সিঁড়িভাঙ্গার কাদামাখা

ইতিহাস বুকে বর্বর শহর আর প্লাস্টিক গ্রাম খাদ্যব্যাভিচারের অবশিষ্ট সিফিলিসরাত

প্রভাতহীন অন্ধকারে ডুবে থাকা কামলালাজর্জর সভ্যতার তেজস্ক্রিয়ভয় ও আর্তনাদ

সঞ্চয়ীও সুদজীবিদের কীটগ্রন্থ হৃদয় ফুঁড়ে রাসায়নিক ভাইরাস এলিটদের শুক্রথলিতে

ওফ্ দেখে নেওয়া যাক আর যা যা বাকি কুয়াসার পরতে মাকড়সাজালের ভাঁজে

সাইবারনেটিকষড়যন্ত্র নষ্ট চেতনার শিকড়হীন স্কাইস্ক্র্যাপার যাবতীয় সাফল্যের

গোপনভল্টে

রক্তমাখা বেড্শিট

পিলের শিশি

ফর্মালিনে ডোবানো

সন্তানের আধখাওয়া দেহ

এইসব দুঃস্বপ্নের শেষে, হে তুমি পাগলমাতালনগ্নশিশুপ্রেমিকযিশু অতিবেগুনীরশ্মীবিহীন

এক বসন্তভোর দেখে ফেলতে পারো

ঈভের গর্ভধান ও নদীর জন্মদৃশ্য”[20]

অর্ফিয়াস? অর্ফিয়াস! সঙ্কীর্ণ বালির পথ বিছানো। প্রশস্ত মরুর বুকের ঘায়ের মতো। অসীমসীমা। বাক্সবন্দী হয়ে উঠেছে ধৈর্য। আমি কুকুরের মতো গন্ধ নিয়ে এগোচ্ছি। মহল নেই। এখানেও তৃষ্ণা। পাথুরে উচ্চতা ঝুঁকে এসেছে নীচে। চশমা নীল। একটা দুটো নুড়ি কুড়োনো ইউক্যালিপটাস। ক্ষেতের মতো চষা রাস্তা। বাসের গম্ভীর ঝিমুনি। টুং টাং। লীয়র? দিতির চোখ আকাশে মনে হল একবার দেখলাম। ও কি দেখছে? দৈত্য কি সব দেখতে পায়? উইয়ের ঢিবির মতো পুরোন শুকতারার বুকে আমি হারিয়ে যাওয়া টারজান দেখতে পাই। গুহার ভেতর থেকে ঝলকের আগুন। চোখ জ্বলে যায়। সাদা ঘোড়ার খুরের ছাপ নেই। রোদের রশ্মি-ব্যাখ্যান। ছুঁচের মতো ফোটে। গা ছম ছম করে। দৈত্য পাশার উল্টোদানে। কে তার শালুক পাতা চেনে? কেউ না! এ পৃথিবীতে যতটা হৃদরোগের রাজকর উদারনৈতিক বাজারের মতই পাঁজর খোঁচানোর তুলনায় আকাশছোঁয়া। একপ্রান্তে চোখের মণির মতো খর সূর্য। আমি সুর চাই একটু। এখানে কান্না নেই এতটুকু? আনন্দের খরা আমাকে ক্লান্ত করে। দিতির আঙ্গুল ছোঁয়ার প্রতিজ্ঞা আমার এ জন্মও অস্বীকার করবে কি?

দ্বিধার পুঁজিটা ঝুলছে হালকা হয়ে। আপেলের খোসার মতো লেগে থাকে অস্তিত্বের দাঁতে। মরুমাটিতে কাঁটা ফলের চাষ। তৈলাক্ত বারান্দা। গোবর লেপা দেয়াল থেকে গোরুর উচ্চতা পাওয়া যায়না। সম্ভোগের এককটুকু। চূড়া থেকে চূড়ায় ভাসছে অবদমন। ওকি ব্যবহার যোগ্য! আমার আবার ঘেন্না করে খুব। ভক্তি মূলে ভজন ভুলেছে বিভাজ্য। ঐতিহ্যের গুরুত্বে কান ধরে দাঁড়িয়ে একটা ভাঙা

---

[20] সাত্ত্বিক নন্দী

মন্দির। দুলে দুলে নামতা পড়ে সুহাসিনী। পমেটম শব্দটায় বেশ একটা সঞ্চারিণী-ছাপ আছে। মোহরখানা কার? ও পাঞ্জায় কতদূর নিয়ে যাবে? পড়া না বলতে পারা বালিকার চোখে জল। আমাদের সারদা একবার কেঁদেছিল। হেডমাস্টারের কাছে দুম দুম। আমি। ভুল করে। সারদার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে পার্থক্য ছিল না খুব একটা। আসলে অবিশ্বাসও তো বিশ্বাসই কোনোখানে। একটা একা জীর্ণ হাত মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় বালিকা সুহাসিনীর। কমল নয়। সমুদ্র। পড়া না বলতে পারা অবাধ্যতাকে প্রশ্রয়ের ছায়া দিচ্ছে একাকী বাবলা। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে আছেন। আমার কেমন জানি শীতের দুপুরের উদাসীনতা পেল। গুন গুন করে কানের কাছে কেউ বলতে লাগল উনি হয়তো রোজ এসে বসেন এর ধারে। ধুলোয় আঙুল বোলান একটু।

রোদ আমার পাশে বসল ধুলো না ঝেড়েই। বললাম,"ওকি রে! অপবিত্রতার ভয় নেই তোর?" সে বললে,"জীবন থেকে আমাকে ছেঁচে সরিয়ে দিলে ওসব পড়ে থাকে। বাদ দে...!" একটু অবাক হলাম। “তোকে শালা কখন থেকে খুঁজছি! ছিলিস কোথায়?” বললে, “আতরভাঙা আতসকাঁচে ফুলও ফোটে। আর্কিমিডিসকে বোঝাচ্ছিলাম।” কেমন একটা বোবা হাতপাখার মতো লাগে নিজেকে। ছন্দপতনের দোষ আমরা অক্ষরকেই দিয়ে থাকি। আঁচলের তলায় দেখি না। একটা সিগারেট ধরালাম। ধোঁয়া দেখে মেঘ একবার ইতস্তত করলে বটে। তবে গড়ালো না কিছু। এ মরুভূমি দেয়াল তোলা। কুচো কুচো 'সভ্যতা'র প্লাস্টার পড়েছে। পাঁচতলা পিরামিড। জেয়সলমীরের জোৎস্না ছেড়ে এসেছি আদিখ্যেতায়। পাতালের এই ঘের যোধপুর। এ মরু নাগর খুঁজে নাগরিক। আস্ত খেয়ে ফেলে সরলতার স্নিগ্ধতা। রাত নেই। দিন নেই। আছে শুধু দোলাচল। সুপুরি কাটার মতো বাতাস কাটছে উঁচু দেয়াল। বড় ওভারব্রিজ সারি শুকের খাঁচার মতো পূতিগন্ধময়। আসলে সব রূপকথার পিছনেই খানিকটা বিষ্ঠা লেগে থাকে। দূরবীনের অসমতা ঐ পর্যন্ত ছুঁতে পারে না। আর খালি চোখে যশোর রোড কেউ দেখেনি কোনোদিন। ওসব জায়গা বরাবরই ঝাপসা হয়ে থাকে।

দিগন্ত নেই। তবে ইতিউতিত্বে চোখে নিল এবার। মাঝামাঝি দূরত্বে পুট। একটা পুটকি। রোদ বললে, "ওখানেই দৈত্যপুরী।" শিউরে শিউরে উঠছে বালি। বহুদূর তার আকর্ষণ নিচ্ছে হাওয়া। রোদের কথকতায় বিভোর সেই গাছের ছায়া। ওরা এগোবে না। জন্মের সেই স্মৃতি। দিতিকে ছুঁতে এরপর বরাবর আমি একা হারিয়ে গিয়েছি। না হারালে ঐ মহলে পৌঁছনো যায় না। থক থক করছে পাথরের রক্ত। ফাটাফাটা ঠোঁট। বব ডিলান সুমনের কণ্ঠে জানান, "কতটা পথ পেরোলে তবে......"! পায়রা নাচছে। পায়ের নীচে সরে সরে যায় দিক। আমার চুম্বকে চিত্রহার বাসা বাঁধে গোপনে। শঙ্কিত দুরুদুরু বুকে আমি হারিয়ে যেতে হারিয়ে পড়ি। একটা তীর। বিঁধে আছে বেদীর মাঝামাঝি। তেল সিঁদুরে পিচ্ছিল। এই তীরেই ভারতবর্ষ বিদ্যাসাগর-বধ করে আসছে যুগান্তর। মাথায় বাঁধা অস্তিত্বের রুমালটা আমি খুলে রাখলাম। খেজুর কাঁটায় জন্ম নিচ্ছে সাবলীল হাসনুহানা। আমি তার শব্দ শুনতে চাইছি শুধু।

একফোঁটা কান্না চাই। শুধু এক আদুর গায়ের সুর। এটুকুই...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৬শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ১২টা ২০

একাকীত্ব চাপ মেঘমন্দিরের শুক্র উত্থিত লিঙ্গের সহজপাঠে বজ্র শানায়, শুনতে পাও?

মহলের দাঁতসারি অঘোরীর চোখরঙ্গা ছাই, নিশুতি শস্য তবু অনুমিত কথ্যক সম, ত্রিভঙ্গ একাকার কালী জঙ্ঘাপরে

এন্ট্রি ১৩

"বমি পাচ্ছে? বমি পাচ্ছে দিতি?" হারানোর আগের মুহূর্ত। কে জানে তা গর্ভের অনুরোধ কিনা! যৌনতার সেতুর ওপর দিয়েই জন্মের হাতেখড়ি। দৈত্যের চর ফোটে কখনও কখনও। বাস ভর্তি ধুলোর জটার উপর মরুভূমির স্তনবৃন্ত। নাক ঘষে কামড় দিচ্ছে সাদা মেঘ। সঙ্গমের আগে। লাল হয়ে এসেছে ঘাসের রঙ। পুকুর নিজের বুকে ধরেছে ছলকানি। শ্যাওলার রঙ। কৃষ্ণচূড়ার তলায় রাধা আসে নি কোনোদিনই। কদমে পা পিছলে কোমর ভেঙেছে রসশাস্ত্র। দেখেছ! বলেছিলাম! পাথরের ঘট। এট্টু দেকে শুনে এসো! কতা শুনেছে কোনও দিন? হারামজাদা শুয়ার। গালি দিয়ে ঠোঁটের রসালো বিদ্যাপতি মার্কা খৈনির থুতু ফেলে বাৎসায়ন। বহুদিনের ছিবড়ে নরমও পৌরুষের মুখ জ্বালিয়ে দেয় বারবার। এভাবেই হারিয়ে যাওয়া সাধনা হয়ে ওঠে নগরজীবনে। ট্রামলাইনে মরার অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে হামাগুড়ি দেয় স্বাভাবিক। আমার পোড়া কপাল। 'সঘন' শুনলেই কেমন ঘনিয়ে আসতে মন করে। মেঘকে বলেছিলুম সে কথা। সুগঠিত বুকের পেশিতে ঢেউ খেলে মেঘের। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। চোখের ঝলকানি হয় দধীচির পাঁজর। ঘামের মতো উষ্ণতা বয়ে বেড়ায় হাওয়া। মেঘ আরো বুকে টেনে নেয় বালি। কৃষ্ণের সব থেকে কৃষ্ণরঙ্গা উদযাপন। স্তরের ভেতরে স্তর। স্তরের ভেতরে স্তর। স্তরের ভেতরে স্তর। স্রোতের ভেতরে কে? দিতির চোখ মনে হল! এখন আমি মেঘদূত পাঠাই কিকরে? বালির শীৎকারে হু হু করে ওঠে বুক। এভাবেও অবতরণ ঘটে। চাতকের মতো মানুষ হাঁ করে শুধু উঠে যাওয়ার দিকে চোখ রাখে।

"গভীরতা পড়ে থাকে, উপরে লাফায় তারই জল

রমণীর সাজ আর স্বরূপের বিরোধের মতো

এবং স্বপ্নের মুহূর্তকে আক্রমণ করে, ফসফরাস, শাদা সিঁড়ি,

অটুট দিগন্তরেখা থেকে

বাড়ি নেই

দিনে রাতে দুটি পোর্টহোল্‌ জাহাজের

শুধু সে পথেই যাওয়া, গুঁড়ি মেরে, তীর্থ-পথিকের

লাসা মোনাস্টেরি

ওম মণিপদ্‌মে হুম্‌......।"[21]

শুকনো নদীখাতের দুপাশে কাঁটাঝোপ। ভিরি ভিরি ঝুম ঝুম। কাঁটায় প্রহর গোনে। হাওয়া হাততালি দেয়। পক্ককেশ এক বৃদ্ধের ছবি ভাসে চোখে। নারায়ণ স্যান্যাল রাজস্থানী হলে হয়তো উটেদের মধ্যে আরও বিখ্যাত হতে পারতেন। যোধপুরের লম্বাগুঁফো গাইডের ধাতানিতে শান্ত হয়ে এল নিমপাতার ঝগড়া। আমার পায়ের ফোঁটায় কথার ওজন মাপছে ঘাম। পলকে চোখাচোখি। হওয়ার বোধটুকু

21 শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শেষ হতেই উবে গেল। সর্ষে নয়। তবু হলুদ ফুল। জীবনানন্দের মতো চাষ হয়েছে মরুর বুকে। "......পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।/এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর।/ ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।"[22] জিভ দিয়ে একটা টলুক টলুক শব্দ। হারানোর পথে কেন আশ্বাস যোগায় শূন্যতার পুঁজি? এমন নিরাশার রোদ জীবনকে প্রেম নিবেদন করতে চায় বারবার। জীবন ভাবে কিনা তার প্রেম ভারি প্লেটোনিক। তাই ঠেকিয়ে রাখে। একদিন বাক্স ঝেড়ে যখন বেরোয় আঙুল তখন ক্ষয়ে লিখেছে তার কবিতা। সে আর অক্ষর প্রসব করে না। সহজলভ্যতার বেড়া পাহাড়প্রমাণ দিতি। তুমি তো জানতে! তাই জীবাত্মা পরমের থেকে বেশি নিষিদ্ধ পল্লীতে ঝোঁকে। ভাঙা মন্দিরের ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। দৈত্যপুরী পুটের মতোই দাঁড়িয়ে আছে স্থির। এগোচ্ছে না! ঝটপট ঝটপট করে উঠল কলারটা। ডানার মতো। এতক্ষণে। অগম্যতার বায়ুরাক্ষস আসছে ধেয়ে। ফেরি শুনি, "কে হারাবে বল! চল হারাবে বল হারাবে......" আমি গা ভাসাই। অ্যাই! দাঁড়াও দাঁড়াও। সওয়ারি আছে। হাতুড়ি। ছেনি। পাথরভাঙার চিহ্ন আসছে উড়ে। পায়ের তলায় হারানোর বালি এল...

ঠক ঠক ঠক। ঠান্ডার কাশি। রোদে পুড়ে যাচ্ছে পালিতরা। একতারার তার ধরেছে কালপুরুষ। ভেঙে ভেঙে এগিয়ে আসছে একটা বিড়ালের থাবা। সোনার চোখ। চামচে ভুরভুর করছে কর্পূর। সবুজ থালায় সাদা তির্যক। অশ্বত্থের ছায়ায় পৃথিবীর নেশা মাপছে মাতাল। দাঁড়িওয়ালা দুই বুড়ো তাকিয়ে আছে সোজা। পিচের রাস্তা হারিয়ে ফেলছে মাটির ঋজু উর্বরতা। দিতি। ধোঁয়াশা চারদিকে ফেনার মতো। বাড়ছে, ফাটছে, হারিয়ে যাচ্ছে। অপ্সরাকে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে বারবার। আবর্ত। জোয়ান ভেবে মাছি ফেলছে মুখে ওপাড়ার ঢুলতে থাকা মুদি। ধোঁয়াশা হয়ে মিশে গেল সমস্ত দেয়াল। পাতালপুরীর আকাশ এল থিতিয়ে।

---

[22] জীবনানন্দ

আঙুলের ওপর পাথরের অনুভবে এবার ঝড় পড়ে এল। কেউ আলতো করে নামিয়ে দিল। নামতেই হবে! "আগুনে পুড়ছে যারা, ছিন্ন শির দগ্ধ দেহ, তাদেরও কপালে/ পড়ে নাকি বর্ষাধার, হিম্য তাপহর জলসেক? / কালবেলা চুকে গেলে ঝলমল করে তা-ও বালার্ক সকালে? / আর কত যাবে নিচে, অধঃপাতে, নিম্নচাপরেখ?"[23] এখান থেকে লম্বা সিঁড়ি। প্রতীক্ষা তার বেশি। ঝপ ঝপ। নিম্নাঙ্গ ঘষটে যায়। তবু মুকুট। যেতে হবে। কাশ ধরেছে। ঝুরিঝুরি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল স্নিগ্ধতা। একদিন আরো উঠে গিয়ে জবাব চায়। অন্তঃসারশূন্য বলে কিছু হয়? পরীক্ষা। ছ্যাঁত। বুকে গরম তেল। এগোনোর জ্বালানি হওয়া উচিত। মেঘের কোলে ঘর বেঁধেছে উত্তাপ। শ্বাস পড়ছে সোঁ সোঁ করে মেঘ আর মরুভূমির। কেন? ও কেন ঝাপসা? দিগন্ত আঁচলে ঢাকে কি? টপ। ফোঁটা। টপ। দু ফোঁটা। অবশেষে দূর ঐ মাঠ থেকে বৃষ্টি। শিরশির। মেরুদণ্ডের গোড়ার দিকে। পুড়তে পুড়তে আমি আবিষ্কার করলাম আমার শরীর আছে। দৈত্যপুরীর নহবৎ সামনেই। পুরীটা অনেক দূর। ছুট ছুট ছুট। ঘামের গন্ধ আকাশ জুড়ে। ছোটার সময় সবাই এটুকুই ছোঁয়—প্রায় পৌঁছে গেছি। প্রায় পৌঁছে গেছি। প্রায়...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৬শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ২টো ২১

---

[23] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

মরুর স্তনবৃন্ত তীর্থে ভীড় হয় নাটকের পরও, তুমিই কি বলতে পারো একদিন স্খলন হবে না?

কমুঠো মেজেন্টালি সরকার যখন মেঘান্বিত পালে ঢেউ, তখন মহলদের মাস্কারা জুড়ে একটা অন্যালি জীবন

এন্ট্রি ১৪

ঠিক দৈত্যপুরীর দরজা। ছোঁয়ার জন্য উন্মুখ আঙুল। টুবুক। ছোট্ট ঢেউ। কোলে করে বালি। বিষ্ফোরনের মতো। ছুট তখনও শেষ হয় নি। আঙুলের মাথায় পড়ল এক ফোঁটা। ছোঁয়া গেল না। হাড়। আঙুল গলতে লেগেছে। মাথায় ঝরে চলেছে ক্ষরণ। পিঠ তার জাজিম বিছিয়েছে। একটা ফোঁটার থেকে আরেকটার দূরত্ব বেশি না। খুব কাছাকাছি। দেয়ালের। নজরে তীর লেগেছে। ডানা ঝাপটায় বেদম। পচা দুর্গন্ধ। আমার পিঠে বুকে ছোপ ছোপ। দ্রুত ক্ষত। এই কি? অহং-এর ধর্মগ্রন্থ। হারানোর উপায় গেল আবার গেল হারিয়ে। 'আমি'-র নাগপাশে গুমরে মরে লিঙ্গ। মাংসের স্রোত নামছে গালের উপর দিয়ে বুকে। বর্ণপরিচয়। উটের পিঠের সুর জানায় 'ঊ'-র ঝুলে থাকার ব্যাখ্যান। জলের অনুভূতি। বয়ে আনে বহু প্রজন্মের শঙ্খবেলা। ঢেউ ফিরে গেলে মরুর বুকে কেউ ঝিনুক কুড়োয়, কেউ জগদীশ ভট্টাচার্য। আর মাঝে মাঝে, মেঘের ঔরসে মরুভূমির বুকের থেকে মুছে যায় নষ্টালজিয়া। আমার অস্তিত্বের মতো। গলে আসে অবয়ব। বৃষ্টিতে ভেজা বালি হুঙ্কার তোলে। গিলে ফেলে একটু একটু করে। কেমন করে আসা? কেমন করে থাকা? কেমন করে যাওয়া? এভাবেই শক্তির রূপান্তর হয়। পরিচয় এঁটোকাটার মতো লেগে থাকে। বালির কণা গলিত পেয় শুষে নিল সম্পূর্ন। মরুর বুকে নিজে জল হয়ে জলের আকর্ষণে উত্যক্ত। অনুর থেকে পরমাণু। মহাকর্ষ সবার মধ্যে। আকর্ষ তে একটা লম্বা পূর্ণচ্ছেদ।

গুব গুব গুব। জলের তোরণ ওঠে নাক্কি লেকে। বহু নীচে মাটি সরে যায়। খানিক দ্রাব্যতা। ঘোলাটে বংশপরিচয় বেশ খানিক। বড় বর বুদ বুদ। একটা একটা করে জুড়ে যায়। হাওয়া নয়। শুন্যতার বুদবুদ। বেশ কিছুটা সাম্রাজ্য ঘনালে তল ছেড়ে এগোয় তিথি। আস্তে আস্তে সরে যায় ক্রমশ অস্বচ্ছতার ভান। ফোকাস পড়ে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রকৃতি। চুল ছড়িয়ে বাঁধানো তীরে বিবাহিতা। একা। নৌকার

ভিড় বাঁচিয়ে দলাপাকানো বাস্তব উঠে আসে জলের উপরে। এ আমার নঙ-অবয়ব। পাতলা চামড়ার মতো জল। ঘিরে থাকে শূন্যতা। বিবাহিতা সানগ্লাস নামায়। উফফফ্! ঐ চোখ! কেমন যেন মনে পড়ে, "কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোম্।/ ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্।।"[24] জলের অবয়ব আমার ভাষা পায় বিবাহিতার কাজলে। অঙ্গবিন্যাস নেই। একদলা অচিরাচরিত। কিলবিল মাছ ভাসে শরীর ফোটাতে। মাছের খাবার কেনে আড়কাঠি ঝালকাঠি। চারদিকে আলোর কার্ডিওগ্রাফ। বিবাহিতা আলতারাঙা পা ছোঁওয়ায় জলে। ছড়িয়ে যায় সংগোপন। আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসে তরঙ্গ। ধক করে ওঠে জলের হৃৎপিন্ড। জলের শরীরে ছড়িয়ে যায় রক্ত। চিরন্তন। ছোটো ছোটো নৌকা। বাজি। পর্বতের অনুরণন দৃশ্যমান। নতুন কোমল হাত। লিঙ্গ। আমার শরীর শিশুর মতো স্বতঃস্ফূর্ত। কে কবে তার নাম রেখেছিল আবু। তাই অভিমানে পাহাড় এক বুক জঙ্গল নিয়ে বাঁচে।

তাল? নারকেল? কাণ্ড বৃদ্ধ ষাঁড়ের মতো ফেনিল। ওমা! সে কি? আকাশের বুকে স্বরলিপি এঁকে রেখেছে খেজুর পাতা। পোষাকের মাথা থাকেনা কোনোদিন। কবন্ধ পরিধেয়। রাষ্ট্র জানে। চামড়ার ঝকঝকে বুটের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ে পিচে। কিসের অন্তরাল? আলেয়ার হাঁসুলী। শহুরে হিম সংস্কৃতির ওপর জমে। ভেজায়। জল ডুবডুব বুক। বিবাহিতা দাঁড়াল আমার বেঞ্চের সতীন হয়ে। ঠোঁটকাঠি ছোঁয়ালে। ছোট্ট আয়না। তাতে মুখোশের ছবি আঁটা। চোখে লাগে। সরলতা। জট পড়া জীবন কাটে ইঁদুরের মতোন। "এত তাড়াতাড়ি ফিরলে? সে কই? আমি যেন জানতাম তুমি ফিরবে।" শব্দ সাজানো অতীত আলপিনের কৌটোয় ডুব। বলি,"তুমি জানো না অহং-এর পরিক্রমা। আবর্তের ঘোর না কাটলে ওকে আনব কোন পথে? আর যেন টুকু থাক। তোমার কাছে নগ্নতাই আবরণ আমার। তুমি তো জানবেই!" ওর চোখ ছলছল করে উঠল। কিছু একটা বলতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। রুমাল দিয়ে ধুয়ে নিল

[24] জয়দেব

নিয়ন আলো। কোল ঘেঁষে অধিকার যাচাই করে বলল, কেন বলতে পারো? মরার দরকার আমার ছিলটা কি? আজ অবধি তো বুঝে উঠতে পারলুম না।" অভিমানে শব্দ গাভীন হয়। আমি ওর কপালে একটা ঠোঁট একে বললাম, "জীবন কখন কিসের নেশায় বুঁদ হয় তা কি জন্ম বলতে পারে? দেখলে তো কেমন চোরের মতো ওকে নিয়ে পালাল! মৃত্যুর হাতে প্রকাশ্যের চাবিকাঠি যে!" বিবাহিতা অন্যমনস্কভাবে বসল আমার পাশে। তারপর আমার হাত টেনে বুকে ছুঁইয়ে তাকিয়ে থাকল জলে। আমি পাখির ছটফট অউভব করলাম। বুদবুদ নেই। অন্য জন্মের বীজ শুধু কাগজফুলের গাছ হয়ে বেঁচে থাক। সেখানে কলাবতী অবাঞ্ছিতা।

আখেরন অহংকে ফিরিয়ে দিলে। ভাবছিলেম। আমার ধারণাগুলো ফোঁস ফোঁস করে ব্যার্থতার পিঠমর্দন করছিল। এই পথে কেমন কেমন! টুকরো টুকরো অনাবিলতা। এখান সেখান। রাস্তায় গুটি ধরেছে মুঘলের। তলোয়ারের ঝিলিক। জেবউন্নিসার কবরে আর তা দেয় না পদ্মপাতা। ঘোড়ার পেশীতে পেশীতে মাধবীলতার শিকল বাজে। শীতল দুপুরে বিবাহিতা সূর্যপ্রণাম সারে। মন্ত্র ভাসে,'যেতে নাহি দিব'! এ কি এক পৃথিবীর আঁচল? নাকি দূর তারার কক্ষে নিভে যাওয়া বুদ্ধের সম্বর্ধনা। আত্মদীপ ভবঃ। সহসা আলোকিত হয়ে ওঠে তুলসীতলা। একটা কুকুর পা উঠিয়ে পেচ্ছাপ করে। আমি চেঁচিয়ে উঠতে চাই, "দিতি দিতি দিতি!" অহং গলাটা চেপে ধরে। বন্ধ হয়ে আসে অকারণ ছন্দের সালতামামি। দিতির খোঁজে পায়ের ক্লান্তি মরে। 'আমি' জপের অপরাধ। ছপছপে কাদা। পাঁক যেখানে পাথুরে, সেখানে কণ্ঠী ডোবে না কোনও দিন। অন্তর্জলী যাত্রাও আসলে অপেক্ষা। কিছুটা কমলের। কিছুটা গৌতম ঘোষের। কাঠের পচনে মাশরুমের ব্যবসা। এভাবেই আবর্তনের দাগ ক্ষার দিয়ে মোছার চেষ্টা করে অবধূত। ফের নতুন গতির দাগ ধরে। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে সুতো। যাতে দাগ দেওয়ার মতো পাণ্ডুলিপি আজও জন্মায় নি। তবু শাক্ত জানলা দিয়ে চায়। আলো। ধুলো। আবর্তন ছিঁড়ে এগিয়ে আসে ক্ষরিত অগ্ন্যাশয়, সেই যৌনাঙ্গ দিয়েই...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৬শে অক্টোবর ২০১৮

রাত ১০টা ৫৬

নাচে শ্যাম যমুনাত বাঁশি পোড়ে দ্বেষে, কালীয়অধরে রাধে তোমা হেন বিষে বাঁশিয়ার পরাণ ফাটিছে

এই জল সংকীর্ণ পাতালের ছোপধরা কালসিটে বয় না, মাঝিদের সংগোপন মদিরা রক্তমাটির উঁচু বুক হয়ে আসে

এন্ট্রি ১৫

ইউক্যালিপ্টাসের চামড়া ধোয়া চাঁদ। এখানে ছোপ। ওখানে ছোপ। পায়ের শ্বদন্ত। মাটির কামড়ে রক্ত। রক্তাভ। এভাবে লক্ষ্মী পাতা এখানে হয়েছে কত মাস! একা রাত বেছে কেনে কলঙ্কের মালা। চাঁদের সোকেসে ভারাতুর আবিলতা। কাঁচের পেছনে অসম্বৃত দোকানদার দ্রুত হাতে গুছিয়ে নেয় পসরা। রাস্তায় দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ ছায়া পিছু নিয়েছে। হঠাৎ পিছন ফিরলে ছায়া চমকে চমকে ওঠে। বিবাহিতার ওসব গ্রাহ্য নেই। সঙ্গের আনন্দে ওর ঘোরের সঙ্গম জমে। এক বিন্দু এক বিন্দু। প্রলম্বিত প্রতিবিম্ব। চাঁদও ঢুকে আসে সেই চোঁয়ানো ঘামে। এক পা ছায়ার বুকে দিয়ে বিবাহিতা আমার আগে আগে। খ্যাচ খ্যাচ খ্যাচ। হাসি। ঝাঁকড়া গাছের উপর বাসা। প্যাঁচাটার নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে। সুতো ছিঁড়ে আসে মাথার ভেতরে। পায়ের ছন্দপতনে উষ্ণতা। স্বাস্থ্যের ধোঁয়ায় শিশিরের ছানা কাটে অনর্গল। ওটা কি? একটা লাশের মতো! কাছে যেতে ভুল ভাঙে। ফ্রস্টের টুপি। কুড়িয়ে নিলেম না। যোগ্যতা যার সে আসবে। আমার মন বলছে। ঝপ ঝপ। ঘাড়ের কষ বেয়ে ডানা। চামচিকের টানা সুরমা সরে সরে যায়। বিরক্ত হয়েছে? না! বিবাহিতা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আঙুলের কাটাদাগ আনমনে খোঁটে। আমার চোখের নিচে অন্ধকার, অন্ধকার আরো অন্ধকার হয়ে জমে ওঠে স্মৃতি।

তিল। দিতির পিঠের খাঁজের মতো পিচ। আমাকে নীচে নামতে বাধ্য করে। কেমন গুলিয়ে ওঠে জ্যোৎস্না। একটা অবলম্বন চাই। পড়ে যেতে যেতে আমি বিবাহিতার কোমরে হাত রাখি। এভাবেই ডুবতে চায় সূর্য। পাহাড় থেকে ছলকে ওঠে দুধ। রঙ। মন্দিরের চূড়া। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। পাথরের ভাঁজে চুঁইয়ে পড়ছে অবাধ্যতা। পায়ের লাগামে রেখা বেঁকে যায় গর্ভবতী হয়ে। আমার কাঁধে মাথা রাখে অচেনা সুন্দরী। নতুনা। সাদা জামায় পিঁপড়ের দাগ। আমার কেউ সচেতন হয়ে ওঠে। এভাবে। না এভাবে। এভাবেই কাছে পিঠে

আলো খুঁজে পাল তোলে শুভ্রতা। লালা জড়িয়ে নেয় পাকে পাকে। শুঁয়োপোকার গুটির মতোন আমরা দোল খেতে থাকি। পাতা আধখাওয়া পড়ে থাকে এককোণে। চোখ ভরা জিজ্ঞাসার অত্যচার করে না নতুনা। "তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই; কতই কী চাই--/ দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই।।"[25] দিলবরা। উচ্ছিষ্টের দলায় যে কাতরতা শিল্প হয়, তাজমহল তাকে ছুঁতে পারে না কোনও দিন। ঢং ঢং। ফেরার ডাক পথে। নতুনা হারিয়ে গেছে সারির ভিড়ে। কাতরে কাতরে ছুঁতে চাই। খুঁজে ফিরি। ফিরি। ফিরি। শেষবারের চোখে ধরা থাকে ইশারা। সেই গঙ্গার ভীষ্মেরা ইচ্ছে করেও মৃত্যুর ঠোঁট পায় না কোনও দিন। আমার দিতির খোঁজ সাধনায়। সাধের শিক্‌লি কেটে দানের ভার নৌকাখণ্ডের শাড়িতে লেগে থাকে। শেয়ালকাঁটার মতো।

শিরিশিরে হাওয়া। জানালার হাল ঘোরে। ক্ষেতের আবেশ। ধনুক টানে গরু। কাগজ। কাগুজে গোলাপি। রক্তের ছিটছিট। হলদেটে বাসি। ফুল। ঝুম ঝুম ঝুম। অনেক দিন পর। নতুন মরণে আসে নুপুরের কান্না। সময় এল এরমধ্যেই। একটা বেড়ালের বাচ্চা কোলে। কোথা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনে কে জানে! বেড়ালটা ঝিমোচ্ছিল। এবার নীচুর গন্ধ পেয়ে মৃদু স্বরে একটা আপত্তি করল। নখ। নখর। ওকি জানে? নুয়ে পড়া সাদা কাঠে জামরুলের মতো আঁশটে গন্ধ। স্কিচ স্কিচ। প্রশ্নচিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়ায় কাঠবিড়ালী। বিবাহিতা তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানে একটু। সময় বিবাহিতার গলা ধরে ঝুল খায়। "দিদি, এমা! তোর দুটো চুল পেকেছে। দেখ! কালো করে দিলাম কেমন!" আঙ্গুলের সুরে রঙ ধরে। বিবাহিতা করুণ ভাবে হেসে বলে, "না ভাই। আজ অমন শুকনো মুখে ছাড়তে আমি রাজি নই। তুই কি মিস্তিরি?" সময়ের চোখে ঝিলিক। ঠোঁট টিপে বলে, "ও তো তাই ভাবে!" "ভাবতে দে। ফালতু একটা লোক। কখন থেকে এগিয়ে পড়ছি খালি। চলতেই পারে না। শুধু এদিক আর ওদিক। উফফ্! বাবা! আর পারি না।" পাহাড়ের চূড়ায় শেষ হয়

---

[25] রবীন্দ্রনাথ

আরতি। রতির কোলে ঝাঁপ দেয় সূর্য। আসলে রতিই সরযূ। বুঝতে পারি নতুনার অলিখিত দলিলে হস্তাক্ষর দ্বিধা করছে একটু। নোনার দুই ভাগ। আপন মনে গল্প করে ওরা। জ্যোৎস্না ভরা ছায়ার সমারোহ। আমি ওদের হাত পা নাড়া দেখি। কেমন নিজের মতো নিজেই ওরা! পুরুষের উপস্থিতি প্রকৃতিকে আকুল করে বারবার। অশান্ত করে। নিজেকে কলুষিত মনে হয় খুব। আমার কাছে এসে সময় গলার গন্ধ নেয়। "তোমার কাঁধে এত লম্বা চুল কার গো? বুকে কামড়ের দাগ আছে নাকি? দেখি!" জামা টেনে নামায়। আমি বলি, “তোমাদের অশুচি করছি ভেবে লজ্জা করছে খুব জানো! বিশ্বাস করো, আমি চাই নি যে আমি চাই! অথচ ‘চাই’-এর বুকের চাঁই সরানো আমার কম্ম নয়।” সময়ের দৃষ্টিতে জমা হয় বিষন্নতা। বলে, “তোমরা নিজেদের এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ভাবো বলো তো?” “বল কি! নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ আর ভেবে উঠতে পারলাম কই? তবে প্রকৃতির সাধনায় যুদ্ধ কিছু কম হয় নি! অন্তত তেমনটাই ইতিহাসে লেখে।” “ওটাও অব্জেক্টিফিকেশন। যুদ্ধ পুরুষাঙ্গ মাপার ফিতে ছাড়া আর কিছু ছিল না কোনও দিন। সবেতেই ছাব্বিশ ইঞ্চি।” আমার মুখটা কি হল জানি না! বুকটা বড় হালকা হয়ে যায়। হেমন্তের গলায় কেউ গেয়ে ওঠে অবিকল “আমি জ্বালব না মোর বাতায়নের প্রদীপ আনি, / আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।।/ আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে, / আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে, / থাক্-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।।”[26] ধূসর নদীতে ভেসে ওঠে মধুকর। সময়ের চোখ। আবছা নিজের দাঁতে কাটা দাগ। জল জমল কি? রামায়ণের নদীতীরকে কি সময়ও ভুল বুঝবে?

দিগাঙ্গনার বুকের কাছাকাছি। নিঃশব্দের অবচেতনে চিরকাল কেঁপে কেঁপে ওঠে অস্তিত্ব। নতুনার বুক। সাদা প্রতিশব্দ। আকাশে ভাসে সেই গন্ধ। পরিচিত হয়ে আসে অন্ধকার। স্নিগ্ধতার কার্পেটে পথের দীর্ঘতারা ঘরোয়া। গুন গুন। বিবাহিতার পায়ের পাতায় ছলকে

[26] রবীন্দ্রনাথ

উঠছে স্মৃতির শুভ্রতা। আমি কানে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। পায়ে পায়ে। গাভীন হয়ে উঠেছে দ্বিত্ব। সময় আরো কাছ ঘেঁষে আসে। বুঝি গাল দেওয়াটাও স্বার্থপরতা। নিজের জন্যই। তা না হলে আমার শরীরটা কী এমন দামী যে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকে পরিপূর্ণতা? সময় আমার চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারে। একটা প্রশ্রয়ের হাসি ওর মুখে। সেই রাস্তাটা! জোনাকি পোড়ে। মাদল বাজে। আদল নেশায় গভীরতা নেই। এভাবে দুধের ওপর হেঁটে যেতে ক্লান্তি লাগে না। হাজার মরণ পায়ের সিম্ফনি হতে পারে। আমি অন্ধ হতে পারি। কিন্তু স্পর্শ নেব। শব্দ মিলিয়ে নেবে মাটির কাছকাছি। বাউলের একতারা প্রোথিত এখানে রাতের বছরে। চটপট চটপট। আবহমান। চোখের কুয়াশা খানিকটা কেটেছে। সেই সন্দিগ্ধ আলোয়ানের ফাঁক দিয়ে আমাদের দৃশ্যপট। সামনে রাস্তায় হেঁটে চলেছেন জর্জ। মাথায় রবার্ট ফ্রস্টের হ্যাট। অনুরণন। কানে ঠোঁটের উষ্ণতায় ভাসছে— "আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে......"[27]

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৭শে অক্টোবর

রাত ১০টা ২৫

[27] রবীন্দ্রনাথ

যে গুল্মে যোনির মতো চোখ, সরীসৃপের ছায়া কাটা নক্সা, আর সোনালিমা শীতের ফসল, তার পাতা আমার বসতি

ছায়াছবিতা বিতানো পার্শ্বিকের কোল দেয়! গুঁড়ি দেওয়া বরফের বুকে লখীন্দরের পদচিহ্ন, ধূপ থেকে ধূ ধু...

এন্ট্রি ১৬

ঘুম ঘুম। ঘুঙরু। ঘুঙ্ঘট। ঘাঘরার চোখ। চোখের বিস্ময়। আলু থালু মার্বেলে ফেটে পড়ে নিবেদন। পায়ের নীচে কিছু নেই। শূন্য। দারুচিনির ছালছেঁড়া রঙ। গন্ধ। আবার ওভারব্রীজ। বয়ে যায় সংকীর্ণা। ঝুমঝুমি হাতে। পাথরে বাঁদর নাচায়। হাতে বেতের ঝুড়ি। একপেয়ে স্তূপ। ছায়া আসে পাথরকুচি বেয়ে। রোদ মুখ বাড়ায় গাছের জানলায়। "কিরে? ব্যাগ কই? শালা ডোবাবি দেখছি!" বলি, "আছে আছে। সম্পূর্ণার সাধনায় শূণ্যই নির্বাণ। তুই মাল এখন ওঠ দেখি! রোজ রোজ কোলে নিতে পারব না!" রাগ করলে কিনা কে জানে! মুখ ঘুরিয়ে নিলে। হলুদ ক্ষেতের বেগুনি শাড়ি। খোলা আকাশ। শ্বাশুড়ি বউয়ের আঙুলে মাখিয়ে দিচ্ছে আদর। নিজেরই শৈশবে ছায়া দেয় মহীরুহ। চোখের আবর্ত ছাড়িয়ে চাকার আবর্তে ঠেকে জীবন। বিবাহিতার খোলা চুলে নেমে আসে বালিয়াড়ির ঢেউ। হাওয়ার পালে মজা নদী স্রোত ধরায় একাকী। এও কি যৌবনবতী হবে? বুকে নেবে সোনার তরী? একটা ভাঙা হারমোনিয়াম। ছড়িয়ে আছে দু পাত্তর। শচীন কত্তা গাইছেন, “কেঁ যাঁস রেঁ...”। উত্তর দেওয়া যায় না। অনেকটা দূরত্ব। আমি নড়া দাঁতে নাড়া চিবানোর শিরশিরানি উপভোগ করি মাত্র। ক্ষেত কামানোর পর যে বোঁটা পড়ে থাকে বুলবুলচণ্ডীতে তাকেই নাড়া বলে। সব কিছুতে পায়জামা নামাতে কোথাও বাধো বাধো ঠেকে।

“তুমি তো কিছুই নিলে না, অক্ষত-যৌবন, প্রেম,

দ্বিধাগ্রস্ত আমার পৃথিবী; সুজলা-সুফলা বাংলা,

প্রিয় জন্মভূমি, শ্যামরক্তে পোষা নীল পাখি-;

-তুমিতো কিছুই নিলে না।

....

বিষাদে বিষাক্ত দেহ তুলে নেবে তুমি, জেলেরা যেমন করে

ত্রস্ত হাতে জাল থেকে মৎস তুলে নেয়-;

অথবা বেদেনী যেমন সব খেলা শেষ হলে বাক্সে ভরে

দন্তহীন, ক্রীড়াক্লান্ত বিষাক্ত গোক্ষুর।”[28]

নতুনার স্মৃতির আতর। বিবাহিতা আমার কব্জিতে চেতনা ডুবিয়ে ঘ্রাণ নেয়। খট খট। উটের গাড়ি। এ পথের ইতিহাস তাড়া করে এ জন্মকে। হেমন্তের বোল ধরেছে গুল্ম। "সেদিন তোমায় দেখেছিলেম ভোরবেলায়..."! ক্যাচর ম্যাচর। সারাদিন চলে চাকা। সূর্য হাতছানি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়ে। কলাবতীর কুচবরণ। চিলের মতো ঘোরে। ডাক দেয়। রাজকন্যের বিষে অচেতন বিশালাকায় হায়ড্রা। থৈথৈয়াঙ্কে পটভূমি থর থর থর বোনে। জালের ওপর মাখন শুকায় নন্দ ঘোষের ছেলে। ছবি। ছবিতার উপকথা। থেমে থাকা জলে মরুর সবুজতা খেজুরে আলাপের মতো হাতখানেক গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। স্লপ স্লপ। হায়ড্রার উদরে স্রোত। ভাসি চুনাপাথরের ঘাসে। সর্পিল। পাতার ছাওনি। চকচক করে খৈনির প্যাকেট। অচলতা পরিত্রাণ চায়। আমি আকন্দের মতো বর দিয়ে ফেলি। টুপ টুপ।

---

[28] নির্মলেন্দু গুণ

তরুক্ষীর লতা বেয়ে পড়ে।

দোলন চাঁপা দোলন চাঁপা। না। ওরম পাতার ফুলঝুরি। মেবারের গেঞ্জির বাইক। উরিশশাআআ! চিমটি। আমি বিবাহিতার নখের দিকে তাকাই। বাইরের ক্ষেত একবুক ইঁটভাঁটার ব্রণ নিয়ে মুখ নামিয়ে আড়াল দেয়। শক্ত পাথর কাটলে শাক্তমন্ত্রে ভুল হয়। রাস্তাও হয়। বিবাহিতা আড়চোখে মাপে। ঠোঁটের কোনে লুকিয়ে রাখা হাসি উপচায়। দু হাত। হুর হুর হুর। পাথুরে মেঝেয় ছুটে আসছে অবাক হওয়ার ক্ষমতা। আমি বিবাহিতাকে ডাকি। কাজল মেঘ বেয়ে ভেজা উঠোন। ধান শুকোনোর গন্ধ। বিবাহিতা একচোখ বিস্ময় মাখানো ঠোঁট নিয়ে বলে, "কী?" আমার চোখ এগিয়ে যায় বিস্ময়ের উৎস সন্ধানে। মাঝে কিকরে ঠোঁট আলপনা দেয়, বুঝতেই পারি না! বিবাহিতা কপট রাগে চোখ পাকিয়ে তাকায়। আমি দেখি “গহন কুসুম কুঞ্জ”[29]। ভেজা। ভিজে উঠছে। ভিজতে চাইছে। আমি চোখের উপর ঠোঁট আঁকি ওর।

"আবার নদীর পারে ছেড়ে যাবে বলো?" বিবাহিতার দিকে চাইতে ভয় করে। কিন্তু দিতি যে আমার সাধনা। বিবাহিতা যে বোঝে না, তা নয়। তবু নারীত্বের চিরন্তন দাবী! তা কেমন করে এড়াবে ভুল? অভিমানিনী মরুভূমির কুয়ো। আমি ওকে নতুনার গল্প শোনাই। মিট মিট। পাথর চেয়ে থাকে। বাবলার ঝাড়ে সূর্য ঝিমায় কিছুক্ষণ। আবছায়া কাগজ ফুলের রাস্তায় চাকার শন শন শব্দ। হলদিঘাটি। হাতি দুলছে। চেতকের হ্রেষায় ছেতরে যাচ্ছে ঔপনিবেশিক আনুগত্য। ধুলোর বুকে একটাই ছায়া পড়ছে। দুলুক দুলুক। রানী রঙে ঢেউ। কোমরের স্রোতে কাঠকুড়ুনি চলেছে। মাথায় আগুনের প্রতীক্ষা। হয়তো ঘরে পথ চেয়ে আছে একটা ছেলে। হেঁসেল ঠেলে ক্লান্ত স্বামী

---

[29] রবীন্দ্রনাথ

সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে জড়োয়া। সূর্যকে আড়াল করে পরাবে আজ রাতে। সন্ধের দোলায় ইতিহাস ইতিহাস নামতা। একটা বাচ্চা আধখাওয়া পেয়ারা হাতে হাঁ করে বাস দেখছে। দেখে ঝুলন্ত সূর্যের বিঁধে থাকা কাঁটা গেল ঝরে।

উপরে রাণী। এক ফুট ছয়। পাঁচটা সিঁড়ি নীচে মহারাজের দরবার। দুফুটের গম্ভীর পায়চারি। নাট্যমঞ্চ স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী। আল । এখানে পাথর হয়ে থাকে। রক্তের রঙ কালো হয়ে এল। চরতে থাকা মোষের শিঙে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। বিবাহিতার আঁচল টেনে ঘাম মুছি। "নতুন শাড়ি! দূর তুমি না! যাতা একেবারে।" কপট রাগে মেঘ ঘনায়। অন্ধকার ঘর। আমার মনে পড়ে বৃদ্ধা বাঈজীকে। একা একা ছড়া কাটে,"শাঁখা চাই? শাঁখা? জয়া! ওকে বলে দে..."! কেউ শোনার নেই। এভাবেই মানুষ নিজেকে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। অনিশ্চয়তায় দোলাচল। বুককে বোঝায় আবৃত্তি, "বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।" দিতিও কি তাই করে আজকাল? বিবাহিতা আঁচলটা টেনে নিল বুকে। আমরা পা বাড়াই ভাঁ সঁ-র স্টারি নাইটের আকাশ পিছনে রেখে। আলপনার দেশ। গাছের জন্মদাগ রাস্তায়। এখানে। ঠিক এই মোড়ে গতবার দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। রামপ্রসাদের মতো আবর্তে থেকে প্রকৃতির সাধনার আশায়। “ও কে কাঁদছে গো ধন বিহনে। / সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।।”[30] একটা মৃত্যু অনুভূতি আনে। অনুভূত হয়, পথের সাধনা চিরকাল পথিকেই করে। ঘর তার শক্তির মূল। উত্থিত ঋজু যৌনাঙ্গ মাত্র। একতারায় সন্ধেপ্রদীপ জ্বালতে সূর্যেরও একটা কাদম্বরী লেগেছিল! ভুলে যায়! মানুষ ভুলে যায়। বেঁচে থাকে ফার্স হওয়া ট্রমা। তাই মৃত্যুকে চিনতে আজও কীর্তন লাগে মানুষের। "তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে ..." আর "তুঁহু নাহি বিসরিব, তুঁহু নাহি ছোড়বি" যুগ্মবেণী গঠন করে তাই প্রতি রাতে। যখন পথের কাছে পথিক এক পথ নিতে আসে...

---

[30] রামপ্রসাদ

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৮ শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ১২টা ২১

এন্ট্রি ১৭

খেয়াল। তানের থেকে মনের মোড় বেশি। পলেস্তারার আলো। জল ধরে রাখা রাস্তা। আয়নায় ঝঙ্কার তোলে হাওয়েলী। ধা ধা ধিন। বেহালার আবহ। বিবাহিতা বাজারে গিয়েছে। নতুনার দিকে তাকাতে তাকাতে ছবি। মোনালিসার পাশে অন্তহীন লাল শালু। কুকুরের চোখ জ্বলজ্বল করছে। আর একটু এগোনো। ঠুক ঠাক। হাতুড়ি পড়ে রাতে। রক্ত। পুকুর। মানসিংহের সাজাওট মনে পড়ে। ঝল ঝল ঝলাৎ। লিওনার্দো ফিচ করে হেসে একটা চুরুট ধরান। দাড়িতে বিনুনি। ঢিল দেয় না আধুনিকতা। মোনালিসার বাঁধানো কাঁচের বুকে দোল খায় ক্যালকুলাসের পেন্ডুলাম। টুং টাং। গ্লাসে গ্লাসে ঠোকা। নোটবুকের কাটাকুটি। ফ্রেম বাঁধানো রাতে আমার শীত করে খুব। কেমন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি। আসলে শীতের রাতে আমার মনে পড়ে যায়। একটা খুন।

"নতুনা ঠিক তোমার মুখের আদল, জানো!"—ছবি ছুঁতে ইচ্ছে করে। মোনালিসা অবাক হয়। “নতুনা কে?” “ঐ যে বললাম, একদম তোমার মতো দেখতে। ঐটুকু আর কিছু স্পর্শ সে রেখে গিয়েছে আমার কাছে কেবল! পরিচয়।” মোনালিসা টেবিল খোঁটে। অপরিচিত অপরিচিতার নক্সা কাটে। নক্সী কাঁথার মাঠে একা ফরাস। পাশ ফেরেন প্রতাপ। ঠক্। গ্লাসের বোল। টেবিল চাপড়ায় একটা শঙ্খচিল। আমি বুঝতে পারি নেমে যাচ্ছে ও। মোনার ধাতে নেই অসহায়তা। এতদিন যে পুরুষের চোখের ছেদ উপেক্ষা করতে পারে, সে অলাতচক্রের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়েছে। নাভির থেকে একটু উপরে। ভুসসস্। সোডায় ভাসে এক একটা বহির্দ্বন্দ্ব। বিটকেল বিড়ালের চোখের চারপাশে পোকা থ্যালথ্যাল করে। খাঁজে খাঁজে বাদামী রাত। থরে থরে শরীর সাজানো। আমার ডান কাঁধে হাত রাখেন সাদে। মোনালিসা অন্যরকম হাসে।

ফাঁকা সমস্ত হোটেলের খিদে পায় থেকে থেকে। অন্ধকার। খিদে জমায় ভিখারিনীর মায়ের মতো। মানিকের রেখে যাওয়া বোতলে জীবন ভরে রামী রজকিনী। টাকা সাতেক লিটার দরে। আমার আবার শীত করতে থাকে। পাখা বন্ধ করি। মোনালিসা ঘনিয়ে বসে। লিওনার্দো-র পছন্দ হয় না। এক টানে ছিঁড়ে ফেলেন মাতলামো। ভেঙে আসে ইজেলের দোলাচলতা। অহং-এর বাড়িতে অস্ত যায় ছন্দ। বেহালার কান্না। আমার আরও আরও এবং আরও শীত করে। কুয়াশা কাটতে থাকে পূর্বের ঝাড়বাতিতে। কাঁচুলি তুলে বুকের তিল দেখায় দিগাঙ্গনা। ভেলভেটের মতো অন্ধকার বুকে দপ করে জ্বলে ওঠে দাম্পত্য। শৈলেশ্বরের খাতা মনে পড়ে। তিন বিধবার থান। চাঁদ হয়ে ওঠে নিরাকার।

"তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়

হে ঘোড়া, কলকাতায় তিনগেলাস স্বাস্থ্যসুধাপান

পরিত্রানীহীনতা হাসে পুরুতের নামাবলীগীতা

ধাতুধর্ম সাতবার গড়াগড়ি খায়........."[31]

ঝসসসস্। ফ্লাশের সঙ্গে মিলিয়ে যায় পাহাড়ের রেচন। মোনালিসা বলে, "কে তুমি?" এতক্ষণে? আমি খুনি। বলতে পারি না। জিভ নড়ে

[31] শৈলেশ্বর ঘোষ

শুধু। গ্লাসটা তুলে নিয়ে তাতে দুচামচ চাঁদ দিই। গলির কুকুরের মতো লালা আসে আমার মুখে। যে উত্তর নিজের গলায় ফোটে, তাতে চুমুক দেয়া চলে। নিবেদন হয় না। উঁচু নীচু সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসে সে। আমি ওর জন্মে তাকাই। লিও-র জেনেসিস আমাকে নিস্তব্ধ করে। গির্লান্দেও চুলে হাত বোলায় নিজের। আমি ইশারায় বারণ করি। মুহূর্তের পানশালায় বিমূর্ত হয়ে ওশরুম থেকে বেরিয়ে আসে জোৎস্না। মেঘের সিঁদুর খেলা। এই গলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কতদিন। গুটি গুটি চার পাঁচ জন আমি বেরিয়ে আসি রাস্তায়।

হলুদের দ্বিধা জ্বরের মতো পুড়ছে। মোনালিসার কোলে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছেন লিওনার্দো। জোরে কেঁদে উঠছেন মধ্যে মধ্যে। বালির স্রোতের বিপরীতে ঘন্টানির আওয়াজ শোনা যায়। আলোর বিপরীতে অন্ধকার নয়। ছিল না কখনও। অন্ধকার গ্লাস। আলো বুদবুদ। এখন রাস্তাটা অনেক দূর অবধি দেখা যাচ্ছে। বিবাহিতা। হেঁটে আসছে একা। আসুক। আসতে আসতে আমি আর একবার মোজার্তের ৪০ নম্বর শুনে ফেলব। কাকে ছোঁ মেরে আসবে প্যাঁচা। আজ একটা খুনের গল্প বলব। রাতের আকাশ ঘনিয়ে আসে। লাশ কেউ খুঁজে পায় নি। আসলে বালি আর রক্তের শরীরে কম্পাঙ্ক মাথা খোঁড়ে। ওকে আমি অনেক দিন আটকে রেখেছিলাম। ঘরটার কিচ্ছু ছিলনা। না মুখ না পায়ু। দেয়াল আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে তুলেছিল ও। আমার স্পষ্ট মনে আছে দেয়ালের দাগ গুলো। বারকোডের মতো। আমার ভিতরে একটা বাঘ নখ আছে। মাঝে মাঝে ঝিলিক দিলে মন্দ লাগে না। শেষে যখন মাথাটা লটকে গেল। বমি বমি আর বমির মধ্যে পচে গেল শরীরটা আমি অটাকে চুপি চুপি ফেলে দিয়ে এসেছিলাম চাঁদে। তাই জ্যোৎস্না আজ এতটা বিবর্ণ। মাঝে মাঝে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে চাঁদ। 'ও' টা কে? কে? কে?

"ওকি! পিছনে কে ও?" বিবাহিতার আর্তনাদ। ভালো লাগে। চন্দ্রভান গঘ আর গগন পাল চায়ের দোকানে গিলোটিন নিয়ে আলোচনায়

ব্যস্ত। ইতিহাসের আবর্তকে ফার্স বলে মার্ক্স সবে স্ট্রিটলাইটটা জ্বালিয়েছেন। অজয়ের ধার থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট দিয়ে গেছে পায়রা। বেহালার ঘাটের অভাবকেই বেশি জীবনের কাছাকাছি লাগে। বিবাহিতা আলু থালু হয়ে ছুটে এসে জোরে ঝাঁকুনি দিল। আমার হাত থেকে আগুন ছিটকে পড়ল রাস্তার একপাশে। তুলতে গিয়ে দেখি এক বিরাট জাহাজ। নামল এক জোড়া জুতো। গন্ধে নাড়ি উল্টে আসছে। আমার হাত থেকে ভায়োলিন খসে গেল। আমি ভেজা হাতে বিবাহিতার হাত ধরে দৌড়ে পেরিয়ে এলাম সিকি মাইল। পিছনে তাকাবো না। দৈত্যপুরীর হদিস যাবে হারিয়ে। দিতিকে খোঁজা যাবে না। "সব যে হয়ে গেল কালো..."! কানে আসছে। বিবাহিতার চোখে মৃদু হাসি। নেশার ঘোরে আমি তিনমহলা বৈপরীত্য পেরোচ্ছি। তলপেটে চাপ। ঘাম হচ্ছে প্রচণ্ড শীতেও। শিরদাঁড়া বেয়ে টুপটুপ ঘাম পড়ছে। বিবাহিতা থমকে দাঁড়াল। ধাক্কা। দেয়ালে ঠেসে ধরলে। বিবাহিতার চোখে অনুকম্পা নেই। আমার আর কিছু করার রইল না। কান দিয়ে গলগল করে ঢুকে পড়ছে সুর। পিপাসা। পিপাসা। জল দেয় না কেউ। ও আমাকে আদর করে। আদর করে। আমি বিরক্তির গালিচার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছি অসাধ্যের রাস্তায়। সাধনা আমার ছুঁড়ে ফেলা শ্রাবণের খুঁট ধরে রয়েছে। প্রবল ঝড়ের পর মরুভূমির জঠরেও বৃষ্টি নামে। তখন আর সুরের ভয় নেই। হেমগন্ধে ভুর ভুর করছে উদয়পুর বাজারের এক কোণ। গন্ধওয়ালা জুতোর উপরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন প্যাগানিনি। তাঁর আঙুল চলছে নিরবিচ্ছিন্ন। সমস্ত বিশ্বের চোখরাঙানিকে নিভিয়ে দিয়ে। সমস্ত নিন্দুকের ভার নিজের বুকের ক্ষতে বয়ে। আমি বিবাহিতার নাভিতে ফিসফিসিয়ে বললাম,"এমন ক'রে আমারে হায়, কে বা কাঁদায়..."! পথ যে ভাঙেনি তা আজ শুধু জানেন প্যাগানিনি। তাঁর চির একাকীত্বের দোসর সেই অহং। আর জানে খুন হয়ে যাওয়া প্যাগানিনির লা ক্যাম্পানেল্লা। ডেভিড গ্যারেট জানেন। আর জানি প্যাগানিনির পাশে নতুন গ্লাস নিয়ে বসা আমি। যার পায়ের থেকে বুকের সাধনা এক স্রোতে গিয়ে মিশছে বেহালার ছড়ের টানে, আর টানে, আরও টানে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৮ শে অক্টোবর ২০১৮

রাত ৮টা ৫৭
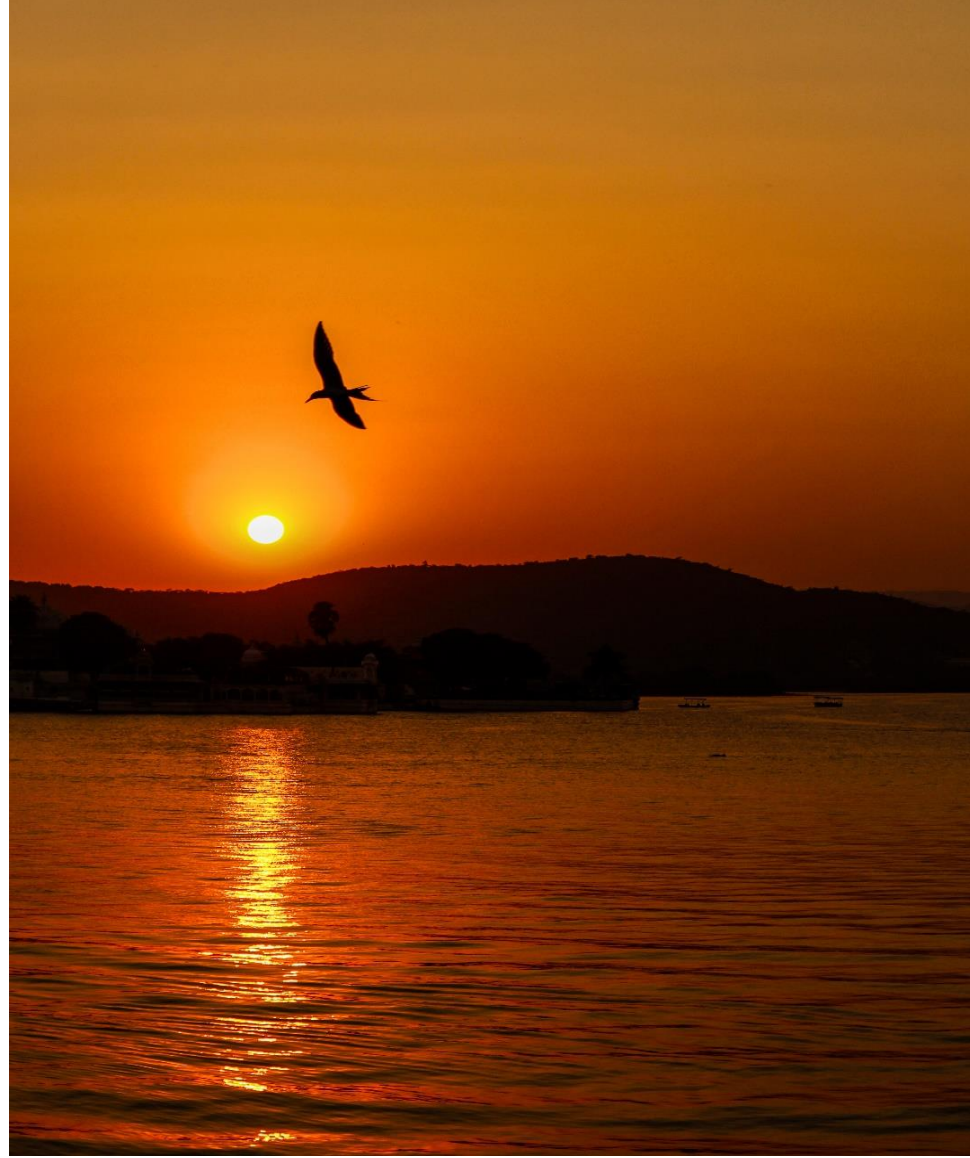
ও রাঙা মরণে সখী পাখোয়ালি রাগে, বাঁশরী শরীরে কেন সঞ্চারী জাগে?

এন্ট্রি ১৮

ভুড়ুক ভুড়ুক। হুঁকো টানে চিতার কাঠ। ফোয়ারা বেয়ে নামতে চাইছে ভুল। মরু। জলের খোঁজ। স্তব্ধতা বাসা বাঁধে পাতার তলায়। উদয়পুর। নারীবাদী লেকচারের শেষে এক এটা কবরখানা ওঁত পেতে থাকে। রাজপুতানার ঐতিহ্য। চোখ সামলে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। সময় কাজল মেখে এসেছে আজ। চোখের তারা ছিনতাই করে পথ। ছুরি হাতে মাথায় ফেট্টি। ঝুপ করে দুপুর আসে। শাঁখ বেজে ওঠে। প্রবালে ভাঁজ পড়ে বয়সের। ঝুমঝুম। ঝুমঝুম। ঝুম ঝুম। ঝুম ঝুম। ঝুম ঝুম। ঝুম ঝুম। ঝুমঝুমি সাপ বাস্তু হয় নি তখনও। বালির কোলে ঢলে পড়ে বালি। রাণীর মতো চারটে পাঁচটা মেয়ে ছুটে আসে গভীর থেকে গভীরতায়।

হাতের এপার ওপার। টিপ ভেবে এগিয়ে যাই। চন্দ্রবিন্দু! বিবাহিতা এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। মাথার ঝাঁকায় ঐতিহ্যের কুলফি বিক্রি করছে দপ্তর। চড়া রোদ। ঝাঁ ঝাঁ। বুকের হাওয়ায় চড়চড় করে অলিন্দ। কে কবে ফোয়ারায় স্নান করেছিল! এখনও দু একটা পায়রার বোলে জলের মাত্রা। স্মৃতি। রোদ বললে,"হলুদের রঙ। দেখ না চেয়ে! শুকিয়ে রেখেছি সৌধ। আমসি করে।" পলকে বাঁচায় অস্থিরতা। বলি,"স্মৃতি কোনওদিন সৌধে বসে নি ভাই। শ্মশান ঘাটে একবার হাত রেখেছিল হাতে। তারপর তো 'সাঁস বহু' করে মোটা হয়ে গেল খুব।"

মোনালিসা চিঠি নেবে। খাম। বান্ধবীরা দাঁত কড়মড়ি। মন্থরার মতো দূর থেকে হেঁটে আসছে আনুগত্য। ঢলঢলে। সময়কে খুব পছন্দ। দশহাত জিভ। গরম মশলার ফোড়ন দেয় সৃষ্টির পায়েসে। হচক পচক শব্দে ছুটছে পালকি। ধাক্কুনাবুড় হেঁইয়ানাবুড়। আমার চিবুক

নেড়ে দিয়ে যান রাধামোহন গুপ্ত। কলকাতার ফেরিওয়ালার ভিড়ে রোদ ঢেকে আসে। অদৃশ্য অস্তিত্বে ছোবল দিয়ে ফেরে শৃঙ্খলা। আমি সময়কে ঠোনা দিয়ে বলি,"যা যা, নাগর এলেন।" সময় ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,"ভালো হচ্ছে না কিন্তু! তুমি জানো দাগ আমার একদম পছন্দ নয়!" আনুগত্য অত কিছু বোঝে না। সে নিজের মতো নিবেদন করে। সময় ছায়ায় সরে আসে। আমার জামার খুঁট চেপে ধরে। এতক্ষণে দূর। দেখা যায়। রোদ ফেরে। রাজস্থান ভিখারি হয়ে দাঁড়ায়। আমার চোখে নাচে রাই,"ওকে আজ চলে যেতে বল না, ও ললিতা!" আশ্রমের পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন উদয় সিং-এর রাণী। দুম দুম। কপট রাগে কিল দেয় সময়। বিষফোঁড়া। ট্যালট্যালে পুঁজ। ঝেড়ে ফেলার আগেই কাছে আসেন রাণী। ভাবনায় ছেদ। গুনগুন করে ভাবা হয়। জন্মান্তর। ছৌ নাচে আর কত্থকে গুলিয়ে যায় পটে।

রাণীর ভ্রূ পথের দিকে। আঙুল প্রসব করে দিক। দিগাঙ্গনা। লজ্জা। রক্ত আর লজ্জার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন হোমার। গলায় নূপুর পরে সময়ের চোখে দিতির জল। রাণীর হাতে চামড়া গিয়েছে পুড়ে। সেই ক্ষতের আকৃতি অবিকল সাফোর মতো। 'সহেলীওন কি বাড়ি'-র খুব পাশেই লেসবসের কুয়াশা। রোদ ঝাড়ে রোজ। রোদঝাড়ুতে টোল পড়েছে। রাণী সময়ের ঠোঁটে চুমু খেলেন আলতো। চোখের তারা। আমার আঙ্গুল ভিজে এল। আমাকে বললেন, "আবার আখেরন? ভাইফোঁটা নেবে না? রাজা প্রতিবছর নিত জানো! রাতের ঐতিহ্যে।" আমি মুখ নামিয়ে আড়াল করলাম শতাব্দী। যমুনা তবে এল আবার এ জন্মে! যম হয়ে উঠতে পারি না। চেষ্টা করি। আমার কানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল হু হু করে মানবতা, অপমানবের গলা ধরে। ঠোঁটের উপর আজকাল শুল্ক বসাচ্ছে কাণ্ডারী। মানুষ হয়েই ফোঁটা নিই রক্তচন্দনে। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। হাঁকছেন আর ছুটছেন নজরুল। পিছন পিছন বিস্কুটের লোভে ছুটে আসছে

একদল বিলিতি কুকুরছানা। মূর্খতা। কুকুরছানারা কোনোদিনই জানতে পারবেনা, শ্যামের বাঁশি সোনার ছিল না। ফেলে দেওয়া দধীচির উচ্ছিষ্টে গাঁথা তার শরীর। তাই নজরুল একবার জন্মান। একবার ভাষা পান। শুধু একবার।

“তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়

করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হ’য়ে উঠি

ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি’

সুন্দরের, কল্যাণের...।”[32]

খস খস। চন্দ্রবিন্দুর অসুখ। ভেঙে আসা ফ্রেমে স্বপ্ন সাজিয়ে রাখে রাজকন্যে। প্রতিটা স্মৃতিসৌধের জড়ে লেগে থাকে আগাছা। কেউ শিকার করে। কেউ মরুভূমি ভালোবাসে। গাছের পাতার বুটিকে নাড়া দিয়ে লাফিয়ে ওঠে রোদ। ছায়া আসে ভয়ে ভয়ে। একটুকরো রুটি। ওর আঁচলে নিয়ে বসেছে এক পাগড়ি। ধুতিতে জাফরি কাটে সভ্যতা। হাত কয়েক তফাত। ঠনঠন। ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলল কেউ জ্বরঠোসা। আমার বস্তিতে পুরুষের শরীর খোঁজা ঠিক এরম। ছয় সাত বছরের শিশু হঠাৎ করে বুঝতে পারে একদিন পেটের নীচে একটা পৃথিবী থাকে। ঐতিহ্যের মোটা মোটা শিক। শিককাবাবে সুস্বাদু হয় অতৃপ্তি। মরুভূমির বুকে আমি আমার বস্তিটাকে মালিশ করি। ফুল এখানে ব্যর্থ। ফল তার কয়েক টনের সিসার সম্পত্তি নিয়ে থাকে। সুগন্ধে পচা পুকুর বোজানো যায় না। অস্তিত্বের মাটি

---

[32] নজরুল

লাগে। দিতির খোঁজ মরুভূমির বুকে আমার কান টেনে ফিসফিস। ঐতিহ্যের বহুতলের সঙ্গী হয়ে নিষ্পাপ দুর্গন্ধও একদিন নিজের ঐতিহ্য তৈরি করে নেয়। মর্ষকামী আঙ্গুল চালনা পাতা ভিজিয়ে রাখে। অনুভব করে না। জন্ম জন্মান্তর আমার দিকে চেয়ে থাকে সাদা পাগড়ির ছায়ায় জবাবদিহির অনুকম্পা চেয়ে একটা লোক। আমি তার হাঁটু অবধি দেখি। বাকিটা ঢাকা থাকে অহং-এর আনুগত্যে।

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

২৯শে অক্টোবর ২০১৮

রাত ১০টা ২২

আস্তাকুঁড়ের পাশে ভোজসভা বাতিকে আসে নি, তারও ভেজা রাজপথ আছে
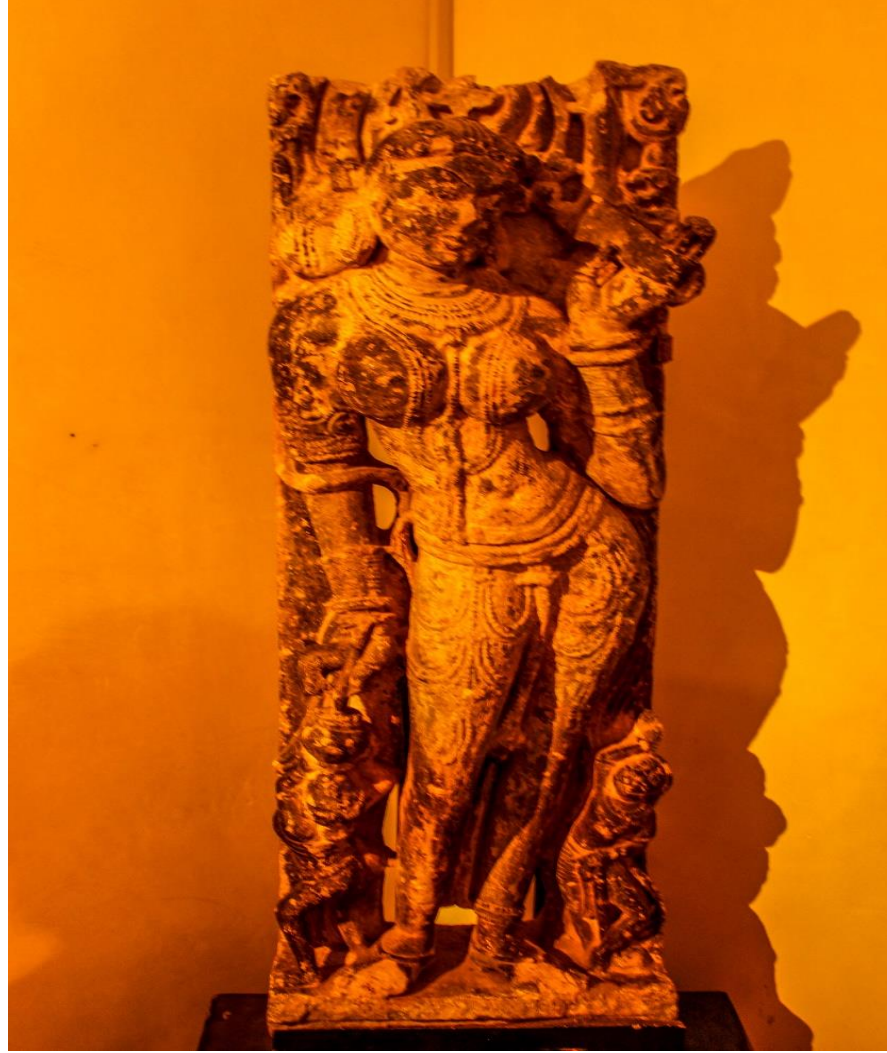
কুলহীনা কুচযুগ ভুঞ্জে প্রতীক্ষা, হৃদি নিজ বাসর সাজায় / অঙ্গজ আমি প্রিয় জঘনে ভুবন ধরি, পথলীনা প্রস্তর প্রায়

এন্ট্রি ১৯

একটা সাদা গাধা। কাল আবর্জনার স্তূপে। সংঘবদ্ধ জটিলতা। টানা হেঁটেছে ষোল বছর। আজ বিদায় চাঞ্চল্য ঝুরিঝুরি। উদয় সিংহের সঙ্গে করমর্দন করে আমি বেরিয়ে আসি রাস্তায়। ফুটছে কেটলির স্বীয় ঘনত্ব। ডট ডট ডট ডট। পথ ভাগের বিভক্তিতে ঘর বাঁধে। বালিয়াড়ির ওপর চোরাবালি শুষে নিচ্ছে একটা কুকুর। নীল সাদা ছাদের পিছনে উঁকি দিচ্ছে পাহাড়। ভীরু ভীরু দৃষ্টিতে। স্কার্ফ। কানে ফোন। এক পলক তাকালে। বিবর্তিতার মাপ হাত। আপেল ঝাড়ে 'গঁড়পতি মেডিক্যালস'। সদ্য ঘুম ভাঙালে মুখে বিছানা লেগে থাকে। পাশ হাতড়াই। কেউ নেই। উঠে বসি। সচকিত। অপাশের পর্দাটা নড়ে ওঠে। নগ্ন হয়ে আমার সামনে দাঁড়ায় বিবাহিতা। ব্যালকনির নতুন আলো লজ্জা পেয়ে ছায়াকে পথ করে দেয়। ওর পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে সোনা। আমি একটা গোল্ড ফ্লেকের ধোঁয়া জমাই ডাকবাক্সে। "কখন উঠলে?" "এই তো! কিছুক্ষণের বাসি চোখ-জাগা!

ওশরুম গেছিলাম। গা ভিজিয়ে এলাম একটু।" চাদরটা সরিয়ে দিই। "বোসো।" ও আলতো করে বসে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সুন্দর সেইখানে সেই মুহূর্তে। 'চিরাচরিত'-এ বড্ড মিথ্যের গন্ধ। সময় চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে বিবাহিতার দিকে। কাঁচের জানালার আলোচনায় রোদ বিবাহিতাকে বিবাহিতা করে যথাসাধ্য।

শ্বাস। আহ্। খড়ম বুনছে খেজুর পাতা। আখের লালে মশার রক্তের মতো আকাঙ্ক্ষা লেগে থাকে। ভোর আসে তার নিষ্পাপ পথের হিসেব নিয়ে। জাবদা খাতা। আঁকড়ে ধরে স্থাপত্য। বিবাহিতার চুলে অস্তমিত চিরুনী। চুলের কাঁটা ঠোঁটে চাপা। চেরি জীবনের বাঁক।

চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,"দাঁড়াও একটু! জানোই তো আমার একটু সময় লাগে! ঝড়ের মতো ছুটতে পারি নে।" ফেটে যায় হাসি। দাঁতে দাঁত চেপে বলি,"দাঁড়ালে পায়ে ঘুন ধরে যায়।" দুই পাহাড়ের বুকের মাঝে সরু পথে হলুদ কাঁথাসেলাই। কেঁপে ওঠে। মাথায় হাড়ি। চকচক। বাড়ি ফেরে জলের সন্ধানী। পাহাড়ি রাজকন্যে। বিবাহিতা আমার দিকে দুষ্টুমির কলকে নিয়ে তাকায়। আমি থম হয়ে থাকি। সময় হাসতে থাকে জোরে। পাগলের মতো। কে পাগল? কথক না কথিত? জোরে টিন পেটানোর শব্দ হয়। বাস এল বোধহয়। আমি সময়কে বলি, “তুমি নিয়ে এস ওকে সঙ্গে করে! আমি এগোলাম।” “অ্যাই দিদি! এতক্ষণ কি করছিলিস বলতো!” আস্তে আস্তে হাওয়া হালকা হয়ে আসে। আমি রোদকে নিয়ে এগিয়ে যাই। জানলাটা নিতে হবে। তবে তো আকাশের চারুপাঠ শুরু হবে!

কলাগাছে জাবর কাটে অনামিকা। চিতোর থেকে শম্ভু মিত্র হেঁকে ওঠেন,"জাগতে রহোওওওওওও"! পাথরের আঁকাবাঁকা অঙ্গরক্ষক। প্রতাপের পঁয়ত্রিশ কিলোর বর্শা। দোকানদার নোনতা বিস্কুট লাগা গোঁফ নিয়ে দেশীর দোকানের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। মাঠ বুজিয়ে রাস্তা হয়। খাঁজে খাঁজে বালির মাশকারা। সাদা চকের একপাশে জলের ট্যাঙ্কি। রোদের দিকে বেঁকে যাওয়া গাছের মতো মোড় ধরে পথ। পরিখার পার্থেনিয়াম ঢেকে দিয়েছে ডায়ান্থাস। নদীর ওপর চাকা। ছলাৎ। বিবাহিতার পাথরে লোভ নেই। বাবলার জঙ্গল ওর বেশি পছন্দ। দুপুর গড়িয়ে যায় কাঁটালো ছায়ায়। মূল পথ থেকে যা বিচ্যুত করে, ছায়ার পরিসর তারই স্বরে বেশি।
বিকেলের ভাঙা ঘর। চুন হলুদ। এগিয়ে দেয় মোনালিসা। আমি সময়কে দেখাই। ও পছন্দ করে না। কোথাও একটা খিটিমিটি আছে ওর সঙ্গে মোনালিসার! আসলে আধিপত্যের একটা নেশাত্মবোধ থাকে। সন্ধিপূজোর মতো সংক্ষুব্ধতা নামে আকাশে। পরিত্যক্ত কাঁটাতার। আঙুল কেটে আঁঠার শিষ নামে। বর্ণালীর প্রত্যাখানে সন্ত্রস্ত পাহাড়। তারের অবয়ব গলায় পরে জোনাকি। কাটা গাছের পাশে শুয়ে থাকে ভাঙা পাথর। স্কুল। পোশাকে ফুল কাটে একদল সুন্দরী। তাদের নাভির থেকেও গোলাপী সুরে কর্ষনের সূর্যাস্ত। অস্তমিত

মোষের পিঠে আলতো ভর দেয় রোদ। নৌকো ভেসে আসে ঘোমটা টেনে। কাশের স্বপ্ন দেখি আমি। বিবাহিতা দূরভাষে আলো মাপে। সময় মোনালিসার আঙুল ছুঁয়ে হাঁটতে থাকে অন্ধকারের কোণ ধরে। যন্ত্রানুসঙ্গের মতো যন্ত্রণা লেগে থাকে ঝিলে। প্রতিদিন পথ চলার শেষে এখানেই ফিরে আসে কৃষ্টি। কথা দেওয়া আছে। দাবার ছক পেতে আমাকে হারিয়ে দিতে বসেছেন অখিল বন্ধু ঘোষ। চেক চেক। মেটের কাছে জমেছে বহুদিনের ঝুল। রক্তের বাসি গন্ধ ধুয়ে দেয় নেশা। মদন ভস্মের দিন। রতিও কি এই রঙ পেয়েছিল মুঠোভরে? আমার সামনের রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। তাঁর ঠোট নড়ছে না। চোখের জলের দাগ ছড়িয়ে দিচ্ছে স্তব্ধতা। ভেসে আসছে, "তখন আর গান শোনাতে আসবে না তো..."! পথের বাম পাশটা আমার জন্মান্তরের স্মৃতি কুড়োয়। আমি চার্লি চ্যাপলিনের গলা জড়িয়ে ভানুকে কাঁদতে দেখেছি। এক আকাশ চুন হলুদ চোখে নিয়ে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩০শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ৯টা ১১
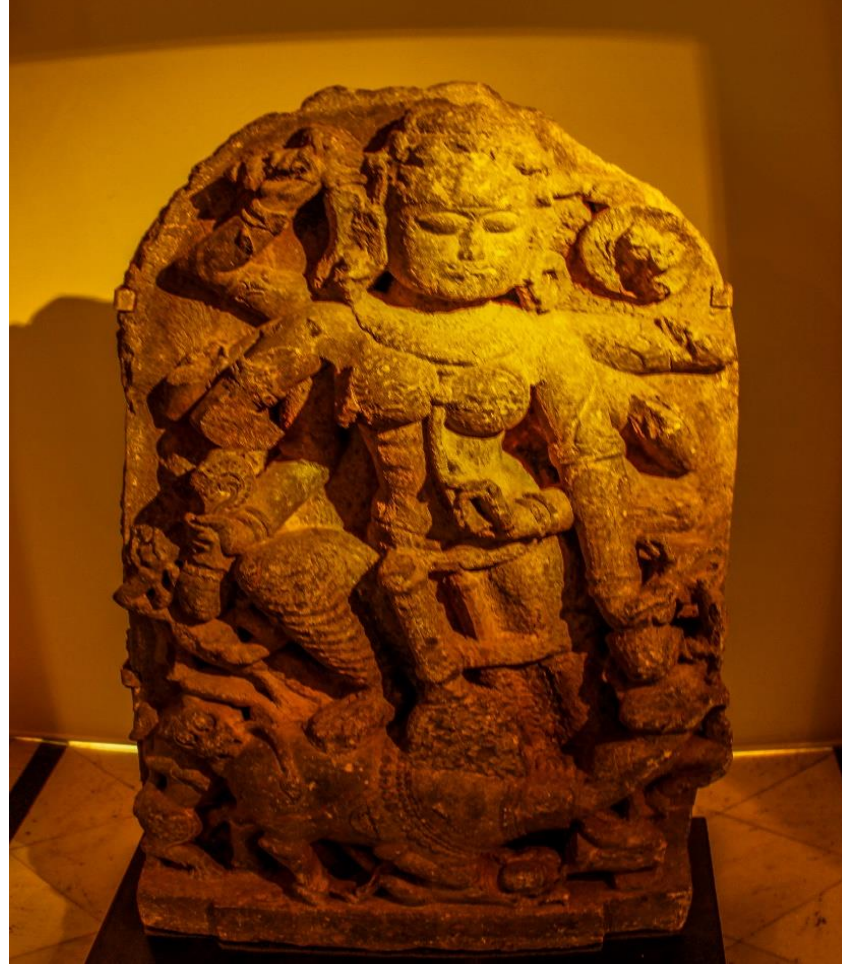
ছেনির ঠোঁটের থেকে ধারালো অন্ধকার, প্রতি খাঁজে পাথর কেটে রক্ত তুলে আনে, শ্যাম পদচিহ্নিত আলতালতা

জানলালি অরণ্যে শাল্বরোদনের পরে, একটুকরো স্বপ্ন এসেছিল, ক্ষয়িষ্ণু প্রত্যাক্ষরে ক্ষরণরচিত লিপি খর খরতর

এন্ট্রি ২০

মার্বেলের দোকান। শকুনটা মটমট করে আঙ্গুল মটকালো। ফেনার মতো উপনিবেশ। রসুনের পাহাড় কোলে ঘাঘরার পসার। পায়ে দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে মোনালিসার অপভ্রংশ। কলকে গাছের হলুদ দুল। মোড়ে একটা একা অশ্বত্থের ছায়া। পাউরুটি আর ঝোলাগুড়। বিড়ালে মুখ দিয়ে গেল। আমি রুমালের মধ্যে লেগে থাকি। রায়বাড়ির কড়চায় লেগে থাকে মিষ্টির রস। ক্ষীর। নেমন্তন্ন খেতে আসে বুড়ো কাতুকুতু। নিমের ডাল থেকে মালগাড়ি সরে সরে যায় ফাঁকা মাঠে। এ পথে শব্দ রাখি বাঁধে আলোর হাতে। চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতা। দুটো লাইনের ফাঁকে আটকে পড়ে বাস। বিবাহিতা আর সময় আলো চালের গল্প করে। মোনালিসার কোলে বসে লিওনার্দো আঙুল চুষছেন। আমায় বলেন, “এইসময় একখান গাড়ি এলে না! বেশ হয়! ছবি দেখব।” আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, “পয়েন্টিলিজম আপনার অনেকটাই পরে। সুরা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা কি আপনার পোষাবে?” উনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “অ! পোষাবে না, না? তবে থাক।”

আমি মালগাড়ির পাশে। বিবাহিতা হাত বাড়ায়। ধমকে উঠি। "কত জন্ম পেরোলো খেয়াল আছে? গতির অস্তিত্ব লোভ কুড়োয় এখনও?" জিভ কেটে ভেংচি। চোখ নামিয়ে বললে,"কি করি বল? স্বভাব! যেদিন শিবের মতো নীচে শোয়ার ভান করব, তখন তুমিও অমনি জিভ কেটে দাঁড়িও! কেমন?" অন্যমনস্ক হয় হাওয়া। শাপলায় জড়ানো পুকুর আমার বুকে। কুটুস গাছ। সিংহদরজায় হেলান দেয় সময়। রোদ সোনালি করে তোলে ভবিষ্যৎ। একসময়ে পাহাড় হয়ে থাকা ছন্দ নিজেকে কুঁদে বের করে আনে। তখন শরদিন্দুর চশমার ফ্রেমে ইউক্যালিপটাসের ছায়া পড়ে। লম্বা বাগানের স্মৃতিতে লঙ্কা গুঁড়ো। বিটনুন কই? "কই রে?" বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে রোদ।

গ্রীষ্মের আমেজ শীতের দুপুরে। পাতার উপর ক্রমাগত পাথরের গুঁড়ো জমে। একদিন পুকুরের সমস্ত সত্ত্বা উপুড় হয়ে পড়ে মরুভূমির পায়ের পাতার ওপর। শাপলার লাশে ঢেকে থাকে মোনালিসার ভ্রূ। হাসি আসে না আর।

রেললাইনের ওপরে দাঁড়ানো বাসের মতো আমি বিবাহিতার চোখে দেখি। বুকের বাঁদিক। দানা বাঁধছে আগমন। ভাঙার জন্যে কুলের প্রয়োজন নদীর। অস্তিত্বের জন্যেও। বিবাহিতা কনুই অবধি মেহেন্দি করিয়েছে। পেঁপেপাতার চরকা কাটছে আগাছা। ঘুপচি ছায়া। বন্দী দুই পৌঢ়া। সবজির মতো ফলছে ধূ ধূ মাঠ। উঁচু লাল ঘাস কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে বিবাহিতার। নলকূপ। চুইঁয়ে পড়ছে তৃষ্ণা। কালো দিগন্তের ছায়া। চিতোরগড় দূর্গ পেরিয়ে আজমীর। সন্দিগ্ধ খরস্রোতের হাত ধরে দাঁড়ায় লম্বা ঘোমটাহীন হোটেল। ক্লান্তি নামে ডালবাটি চুরমা-র গ্রাসের পেখম ধরে। দিতি থাকলে? ওকি মুচকি হেসে গাইত? "রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।/ বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।।"[33] চোখ বন্ধ হয়ে আসে। ভৈরবী রাগ। খণ্ডিতা দিতি? অসম্ভব! ও আমি মিলাতে চাইলেও মিলবে না।

আমাকে সময়ের পিঠে একটা তিল ছোঁয়াই ঠোঁটে। ধ্বংস স্তূপ। আলসেমিতে বাদুড়ের মতো বাসা বেঁধেছে ইতিহাস। প্রতাপের কাল। জরার চিহ্ন বস্তুনিষ্ঠতার চোখে মুখে। একজোড়া ঠোঁট। সদ্যভেজা মনে হল। ইতিহাসের পর্দার আগে সূত্রধর। এক ফোঁটা জীবনের অনুভূতি। দীর্ঘ আবহমান ঝুঁকে এসে দাঁড়ায় এ দরজায়। লাল ফুল। আমি রানুকে খুঁজে পাই। বিবাহিতা আমার চোখ চেপে ধরে। কপটতার থেকে কাগজ ফোটার শব্দে অনেকটা দূরত্ব। খিলখিল করে হেসে ওঠে কেউ। শিউরে উঠি। দিতির মতোই সুর। আমার

[33] জয়দেব

চোখে ভাসতে থাকে লাল মোরাম। নীল ফুল। রামকিঙ্করের বৃষ্টি দেখা। খসখস খসখস। মোটা কাগজে খাগের কলমে লিখে চলেছেন কেউ। মরুভূমির সাধনাই কি শান্তিনিকেতন হয়ে ওঠে? দিতিরা তবে? এগোনোই চায় ক্ষত্রিয়ের হারিয়ে যাওয়া অলংকার। বৈভাষিক মার্গে একদিন সমস্ত ইতিহাস কলাপাতার দোলা হয়। আর নতুনা সম্পৃক্ততা পায় প্রবীনের কন্ঠ হয়ে। ভেঙে যাওয়া স্তব্ধতা আঙুল তুলে বলে,"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন..."!

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩০শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ২টো ৪৯

ইতিহাস প্রস্তরময়, মানবতানুগতিকতা তার রঙ নয়, ব্যঞ্জনা মাত্র

অসংখ্য করোটির দ্রাঘিমা পুঞ্জে পুঞ্জে আলুলায়িত, এভাবেই চূড়া ঘটমান, অংশীদারের শিরদাঁড়া ভার বয় শ্রান্তিক

এন্ট্রি ২১

মোনালিসা কলেজ যায়। একা গোলাপী আদর ভুট্টার খই হয়ে ওঠে। জোনারের বুলেট ছোটে। সাঁই সাঁই। রেস্টুরেন্টের নাম 'ধর্ম কাঁটা'! গিলতে গেলে খচখচ করেন সত্যজিৎ। পিচ গলতে গলতে থেমে গেছে এখানে। রাস্তা নিজেকে ভেড়ার পালের মতো মারে। এক সঙ্গে। জোনারের ট্রাক। বাবলা বনে গোরুর লেজ। গাঙ্গুরের জলে কবাড়খানার শব ভাসে। পাঁচিল দেখছে টিয়াপাখি। একা টিন। ঘর বাঁধা অশ্বত্থের পিছনে সিমেন্ট তোলে ক্রেন। এখানে ঝিলের বুকে ভুরুর জন্ম হয়। খুঁটে টান। আঙুলের মেহেন্দি লাগে বুকে। বিস্তৃত চর। সামনে আখেরনের কালো জল। ফেনার উপরে এক জোড়া ডানা নেমে আসে। জলের বুকে। অনেক্ষণের সঙ্গী হয় ছোট্ট আবিলতা। ঘোলাটে চোখের রঙে জল হয় কর্দমাক্ত। মন্ত্র জপ করতে করতে ভেজা অবয়ব ওঠে তীরে

"কোন অনন্ত নৈঃশব্দ হয়ে আছে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমে

শুধু এটুকু জানার জন্য শংকরাচার্য প্রবেশ করছেন

সম্রাটের শিশ্ননালী পথে।

জন্মান্ধ আর হাত-পা খসে পড়া নুলো যেমন

পায় নারী শরীরের স্বাদ;

আগুন, অনন্ত, অসীম...কোষ্ঠকাঠিন্যের অবসাদ;

বীর্য---মলমূত্র একই মূল্যমান।

আমি যখন আমার পুত্র

তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় নীতিগল্পের বিভীষিকা

আমি যখন আমার কন্যা

চোখের ধারায় ঝরে পড়ে ডিম্বকোষ থেকে স্বপ্নকণা

দুহাতে দুটো রক্ত চোঁয়ানো আপেল, মাথার চুল আগুন শিখা

আর আমি যখন আমি

শিশুকে যেভাবে উলঙ্গ করে মা, সেইভাবে

খুলে দেয় আমার পাগলামি......"[34]

ফলের গাড়ি। প্রতীক্ষারত বাইক। জলে ডুব দেয় হটি। ব্রজেন বন্দ্যো সিঙাড়া হাতে হাসেন মিটিমিটি। এই জলের কাছে বসব রোজ রাতে। পটপট জাল ছেঁড়ার শব্দ। উঠে আসে। মাথা দেখা যায়। খোলা জামার গায়ে দোল খায় নিঃশ্বাস। জলপরীর প্রতিবেশী। ঝোপের

[34] অরুনেশ ঘোষ

ফাঁকে ঘন হওয়া রাজস্থান তখন গুমরে ওঠে। গায়ের চুনি জল। স্বেদবিন্দুর মতো। “তালফলাদপি গুরুমতিসরসম” “কুচকলসম্” গ্রহণ লাগা বলয় সূর্যের ভারে চারদিক রাঙা করে এনেছে। রোদ যেতে যেতে ফিরে দেখে। আঙুলের মাথা ভেজে। পিছল শরৎ নেমে আসে। কেঁপে ওঠে নারী। আমার পাশের বালি। ওঁৎ পাতা ঘোড়ার খুরের দাগ। বসন্তের চিহ্ন। অনিশ্চয়তার উপর আরাম করে বসে। আমি প্রশ্ন করি,"পরিচয়?" সে দিগন্ত বুকে ধরে। ভারে বুক নেমেছে উদারায়। কোমল গান্ধারের মহাকর্ষ পেয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে চোখ। সে বললে, "কেন? কোন জন্মে বিবাহিতা আতর দিয়েছিল গায়ে জানতে চেয়েছিলে? পরিচয় কি? সুকুমার রায়ের স্বপ্ন না স্বপ্নের তাতা?"

বালি ভিজছে। রূপ ধোয়া সিঁদুরে জল পথ টানতে পারে না। আমার একটা বিরাট তেলের কড়াই মনে পড়ে। গুলগুল্লা। গুলগুলগুল্লা। দূরে। ওকি! কি নড়ে চড়ে হিংস্রতায়। সিঁদুরে জল থেকে উঠে আসছে একটা ভালুক। কালো বিড়ালের মতো থম মেরে গেছে হাওয়া। নখ চাটছে জীবিকা। কালো বলের মতো এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে। আমার ভেতরটা খুব হালকা হয়ে এল। নারীর দিকে চোখ। কাজের ভারে আটকে যায় বুকে। বলি, "পালাও, পালাও!" নারী ঠোঁটে অবজ্ঞা। আমার স্বর আর কালো নখের রক্ত। দুটোই জাতিস্মর তবে! পোটো পাড়ার তুলির মতো সংযুক্ত দুই মহাকাল। লাল। চারদিকে তীক্ষ্ণ পোড়া রঙ। কুমোরের চাকায় আমার চেতনা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়। প্রানীটা এগোতে থাকে। ধর্ষিত হয় বালি। গতি বাড়তে থাকে ভাল্লুকের ক্রমশ।

ঝির ঝির। উঠে দাঁড়ায় নারী। নগ্নতা মাথা কোটে আধো আলো লাল সেই চুলে। আমার সাধনাটুকু ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে ঠোঁটে। সে আমাকে দেখেও দেখে না। অস্তমিত সূর্যের মতো। তখন পাড়ের ধূলো পাহাড়ের চোখ ঠেলে ওঠে। কালো ঝড় । গর গর করে লেজ আছড়ায় সভ্যতা। একফালি তরমুজের হৃদয়রঙা হয় নারীর একগাছি চুল। প্রকৃতির রঙ। তাতে কলপ পড়ে না কোনও দিন। ছুটে আসা

ভালুকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে নারী। সমস্ত শরীরের নগ্নতা এবার গাঢ় হয়। রক্তের পোষাক। ভাষা পায় গাম্ভীর্য। আমি নিজের অজান্তেই এগিয়ে যাই তার পাশে। ভালুকের ভোঁতা নখ আমাকে নির্বাক করে। নারী আমার কানের পাশে মুখ আনে। ফিসফিস। মুহূর্তে ছায়া তার মিশে যায় শরীরের লালে। লাল ঘন হলে কালোর দরজা খোলে। আস্তে আস্তে ডুবে যায় নাক, মুখ, চোখ। পরিচয়। শনাক্তকরণ পেরিয়ে হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন। আমি দেখি তার ডানার মধ্যে সংকুচিত হয়ে মিলিয়ে গেল আমার খানিকটা অহং। আকাশ তাকে কোলে টেনে নিল দুহাত বাড়িয়ে। রোজ রাতে ফেরার প্রতিশ্রুতি নেওয়া নদীর বুক তিলের মতো সাজিয়ে দিল অহংহীন আদিমতাকে। আমাকে সে গ্রাহ্যই করল না। ব্যাঙ্গমী। এতদিন যারা সংসারের গল্প করত, এখন তারাও তাতার হয়ে উঠেছে। এ চোখে আবার আমি ব্যাঙ্গমী দেখলাম, হাজার বছর পরে নাম না জানা কথকতার পাতায় তার চিহ্ন ধীরে ধীরে আরও ধীরে গেল সম্পূর্ণ মুছে। দিতির কোলে খুঁজতে হবে আতর আবার। পৌঁছে গেছি। আখেরনের তীর। দিনের পথ চলার ক্লান্তি রাত্রে ভালোবাসা হয়ে ওঠে। আমাকে থাকতে হবে খেয়ার জন্য। ততদিন উজান বেয়ে এগিয়ে যাব খালি। দাঁড়াতে পারি নে আমি। পায়ে বড় ঘুন ধরে যায়, বড্ড বেশি ঘুন...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩০শে অক্টোবর ২০১৮

বিকেল ৫টা ২০

লোচনা অথবা লোচনহীন, ব্যাঙ্গমীরা চিরদিন রাজপুত্রের বীর্যভার সইবেনা মালতী

এন্ট্রি ২২

দড়ির খাটিয়া। বিবাহিতা বসতেই ঝুল। ঐ বাঁকানো চিকুররেখ নিয়েই পাহাড় উপত্যকা গড়ে। পাহাড়ের সমস্ত মুখে নকুলদানার মতো বাবলা ঝোপ। ও প্রহরী শুনে যাও। হাঁটুর ওপর কাপড়। রোদের উঁকি। আটকাতে চায় ঘোমটা। জলসেচ। পা দিয়ে ডলে দেয় মাটি। আকাশের ছোঁয়া মাটির ওপর। গাঁদার আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছে প্রজন্ম। আমি লজ্জাবতীর পাতা দেখি। সে চোখ রাঙায়। আমি বেগুনি ওড়নির দিকে ফিরি। সে হেসে চোখ নামিয়ে নেয়। উঁচু টুকরো পাথরের চাদরে মোড়া রেলগাড়ি। পিছনে পরিত্যক্ত সুর। অশীতিপর স্থাপত্যকে বুকে জড়িয়ে রাখে নিমের শিকড়। দুনি দুনি পাতা ঝুমুক ঝুমুক দোলে। আখের পাতার মতো ভুরু। ছুটে আসে নির্বাসন। সোনার দেশের ধস বড় বেশি আঁকড়িয়ে ধরে।

চমকালো। বিবাহিতা চুলে পরেছে নীল তারা। আমি সময়কে বলি,"ও কি?" মাঠের বুক। ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদা দেয়াল। গোল হয়ে বসে তক্তপোষ জপে রাজস্থানও। এখানে বেদুইন নেই। সংকীর্তন আছে। ঘাঘরার রক্ত আমার কাঁখে কলসি পরিয়ে দেয়। সময় অধর দাঁতে চেপে বলে,"দিদি কোত্থেকে পায় তারা? আমাকেও এনে দিতে হবে!" নাও। জানতে গিয়ে রাগ ধরেছে অভিশাপ। এখন কাঁটার মালা এঁকে দাও পায়ে ভোরবেলা। আমার ডান হাতে ঠোকরাচ্ছে পথ। বিবাহিতাকে আমি দেখি। রেললাইনের উঁচু দু'ঠোঁটের মাঝখানে। পাথরভাঙা যন্ত্রণার ওপর বসেছে মোনালিসার মুখোমুখি। বাঘবন্দী খেলা। ঠুক ঠুক্কুর। খোপের ঘেরে বিশেষ হয় নোনা। পুষ্কর পেরোয় সময়ের আঁচলে। অজমীর।

আমি নদীটার তীর বরাবর এগিয়ে চলেছি। মরা গাছের ছায়ায় হরিণ খেলা করে। খস খস। হাওয়ায় নড়ে শাখা। এলোমেলো পাথরের গানে কাগজ ফুল খোঁপায় নিয়েছে বাগান। আখেরনের ওপার থেকে আরতি ভেসে আসে। আকন্দের মূলে দাঁড়িয়ে কোতওয়াল। রাজঘরানা। কি বিশাল আহরণ। সর্ষেফুলের ক্ষেতে মরণের পাগড়িটা ভারি হয়ে ওঠে। পাঁচরংগা। চারটে স্তম্ভ। চাঁদোয়ার বাটি উপচে ওঠে সান্ধ্য যাপনে।

রঙ। চকমকি অন্ধ করে। আমি ওদিকে তাকাতে পারি না। রোদ নিজেকে গুটিয়ে এনে ফেলে। তারার চাষ আগাছার শরীরে। ধিকি ধিকি। আগুন জ্বলে তুষের মতো। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মান্না দে-কে দাঁড় করিয়ে ঘর খুঁজতে যান। কোতওয়াল কি গাইবে,"ও কেন এত..."? নলকূপে আতা ধরে না কোনও দিন। আতার চক্রবূহ ভেদ করে তলোয়ারের ঝলকানি। দু ইঞ্চি। একটা শো পিস বার করে কোতওয়াল ভয় দেখায়। এইও। সাবধান। আজমীরের দরগার সামনে পকেট কাটে। আমি বলি,"ধুর শালা, একটু তুলে ধর!" ছেঁটে ফেলা গাছে সবে নতুন পাতার স্ট্রোক লেগেছে। ভাঁ সঁ-র মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভিজছে আবেগ। কোতওয়াল গদগদে গলায় বলল, "দাদাগো! দুমুঠো খেতে দেবে?" ভাস্কর। ভাস্কর্য। "আমি শালা ভিখারির চেয়েও ভিখারি."! আকুলতায় বুক বাড়ে। বলি,"কি খাবি বল? চারকোল মাখানো বাংলা না সপ্তপদীর 'টাচ করবে না'?" দাড়ি নেড়ে কোতওয়াল জানায়, উৎপল দত্ত। এখানেই স্কচ আর বাংলা এক করে ফেলে বাঙালি।
গব গব। ঢেকুর। ইঁটের বুকফাটা হাহাকার অশ্বত্থ আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। ইতি উতি। উঁকি দেয় ইঁদুর। খাবারের গন্ধ। কোতওয়াল আরামে ঝিমোয়। আমি তারার দিকে এগোই। পাহাড়ের চেয়েও উঁচু বিজলির তার। সেতারের তারের অনাত্মীয়। নতুন নতুন বিয়ে। ঘুঙ্ঘট ওঢ়েছে খানসামা। আমি একটুকরো অপরাজিত তুলে নিলাম। বিভূতি মাখা সত্যজিৎ-কে এখানে চার্বাকের মতো লাগে। কানের

কাছে সংঘের মন্ত্র। রোদের মখমলে হামাগুড়ি। আবার নদী। বিবাহিতা আর মোনালিসা ছুটে এল। ভাঙা ঠেলা। খঁচ খঁচ। মাটি সেঁকছে ডেও পিঁপড়ে। মানুষ তারই পায়ের ধূলোয় লীন। আমি সময়ের কানে পরিয়ে দিই নীলতারা। ধৈর্যের কৌতুহলে ফুটে ওঠে পান্থ। ধীর স্থির। মুখোমুখি দুই ময়ূরের মতো। প্লেটো যাদের কথা উচ্চারণ করতে চান। বসন্ত যাদের পাশে পেখমের ছাতিমতলায় দাঁড়ায় দুদণ্ড। আজ। হেমন্তের প্রতিকূল এক ছবি, সাদাকালোর মহামানব আরেক ছবির মতোই বিনাদোষে জেল খেটে বেরিয়ে আসে। দাঁড়ায় আমাদের সামনে। সময় লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। নীলতারার কোলে লালের আভাস দোলে। আমি এগিয়ে চলি গোলাপি শহরের দিকে। এক প্রজন্মের কোতওয়াল আত্মসাৎ করতে করতে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

সকাল ১১টা ৫

তারা নীল সন্ধের কাটা কাটান্বিত অলস একটা রাত, বিনতার মতো জ্বলতে জ্বলতে আগুনের লিঙ্গ হয়ে ওঠে

ছায়াবলী ছাঁদে ছাওয়া ছেনালী ছিটিয়ে ছিল, আজ ঋজু স্পষ্ট খঞ্জরে খঞ্জন প্রথম পাণ্ডুলিপির মতো ধূসর ধূমাবতী

এন্ট্রি ২৩

ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ। "শোন শোন শোন মজার কথা ..."! একটা হনুমান মায়ের লেজ জাপটে ঝুলছে। কদমের শিষ। আতাগাছে মৌতাত। মাধবীলতার থোকা ঝুলছে। সাদা বকের রাজ্যজয়। প্রত্যাবর্তন। সোনার থোক। দেয়াল বয়ে বেড়ায় শতদ্রু। পাঁজর থেকে পাঁজরে। ঝর্ণা হয়ে হেডিসের গভীরতা পাল তোলে। কালো অন্ধকারে বুক চাপড়ায় স্থৈর্য। একে একে বিধবার বুকে উল্টো রিলের মতো ফিরে আসে সংকীর্ণতা।আবর্ত। ঠকঠক। ঠকাঠক। মাঝির মাস্তুল কাটে কাঠঠোকরা। নাচিয়ে বেড়ায় দুপুরের মাদারী। ছিয়াত্তরের মরা মাংসের চানাচুর মনে পড়ে। মূর্খের দল জানলোই না কোনও দিন। শিবের কোনো লিঙ্গ হয় না। ঊমার ভিখারিরা জন্মে জন্মে মাধুকরীর আশায় ফেরে। সভ্যতার ছাই অহং-এর মতোই চিনতে দেয় না তাকে।

সত্যজিৎ তাকান ঋত্বিকের দিকে। শেষমেশ ভূতের নাচ। ও বাদে প্রবাদ হয়ে ওঠে না কেউ। গলা চুলকাতে চুলকাতে কুলকাঁটার বিস্ময়। পৌঢ়ার টিপে অপেক্ষার বীজমন্ত্র। গতির আহুতিতে বেঁচে থাকা বাসা বাঁধে অভ্যাসের ঘরে। ওষুধের দোকানের পাশে থিরথির করে কাঁপে কালো একটা মেয়ে। চাদরে জড়ানো শরীরের ছাপ। আস্তে আহ্স্তে। ব্রেক মারে নোঙরার গাড়ি। একটা তোরণ। খুদের সঙ্গে বিক্রি হয় টিকিট। পাহাড়ের বুকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে শহর। গতরাতের স্মৃতি। ভাঙাচোরা টুকরো বয়ে বেড়ায় আইসক্রিমের গাড়ি।

ঝুপ। নিভে আসে প্রেক্ষাগৃহ। দোলনচাঁপার মোটা পাতায় ঝাউ তার অস্বস্তি ছড়ায়। ভিজে ওঠে পাম। ছোঁয়াচে অশ্বত্থ পাতা। খাঁজ বেয়ে

নীরব জোৎস্না। সুপুরি মুখে পিক ফেলে কেউ। বটের ফলে ঠোঁটের কালি। আমি বিবাহিতার আঙুলের ফাঁকে জড়িয়ে নিই শ্রদ্ধা, স্নেহ, পাপ। পাহাড়ের গায়ে কাঁটা দেয়। রোয়ার বিছানায় গান ধরেন প্রতুলবাবু। "করি বাংলায় হাহাকার..."! আমার পাথরছেঁড়া পংক্তি সুর খোঁজে বিবাহিতার বুকে। কৃষ্টি চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। জর্জের গলায় ঋত্বিকের লিপ। অসহনীয়তা মাথা টিপে দেয় কালবৈশাখীর। মোনালিসা আদুরে গলায় কাজে যেতে মানা করে। ক্র্যাঁঅ্যঅ্যাঅ্যাচ। চাকা ঘোরার আওয়াজে সরে গেল পর্দা। আমরা এক কোমর উষ্ণতা নিয়ে দেখি সারি সারি রাজা, মন্ত্রী, সেপাই। শুরু হল ভূতের নৃত্য।

দুদিকে লাল মোরাম। কালো টিকার মতো পথের শেষ চোখে পড়ে না। আখেরন বুকের হাওয়ায় আদর জন্মায়। টিপ পরেছে পথের বুড়ি। শনের মতো রুক্ষতা তার ধুলোর চুলে। লাইট হাউস। লাইট হাউস। "মরুভূমিতে? ধ্যাত!" গা ঠেলে বিবাহিতা। "কূলটার জন্যে বাতিঘরের ব্যবস্থা করে সমাজ। চিরদিন।" আমার মুখে বাস্তবের থুতু বেরোয়। মুখ নামিয়ে নেয় বিবাহিতা ঝটিতে। তারপর মরুভূমির দৃষ্টি। চোখের ওপর চোখ। ঠোঁটের উপত্যকায় নেমে আসে সিঁদুরে মেঘের ছায়া। তারপর বলে, "বাতিঘরে সন্ধেপ্রদীপ জ্বালিয়েছি। জাহাজ পথ না ভুললে, সমুদ্র অমরত্ব পায় না গো!" সাদা পর্দা টানা তখন মঞ্চে। ঝম ঝম। পায়ের সাথে তাল রাখছে কৈলাস। মরুর বুকে খনির প্রেক্ষাগৃহ। কাঁধে তিল কাঁপে দুরু দুরু দুরু। রাজা উজির খোঁজা সামন্ত। মোটা ভূত রোগা ভূত। আধা ভূত গোটা ভূত। আমার বুকে এটা ভাঙা আধুলি ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে বিবাহিতা। হলুদ উগ্র আল ধরে হাঁটতে থাকি আমরা। নদীর একাকী তীরের সঞ্চয় নিয়ে। ভূতের নাচের একটা অনুরণন আছে। আমাদের ঘিরে নাচতে নাচতে চলেছে দুটো ভুতুড়ে ছায়া। প্রাকৃত ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হাতের ছায়াবাজীতে বিশ্বের পরকীয়া ঊরু ছোঁয় শীতের কম্পনের। কুয়াশা নামে, কুয়াশা নামায়, কুয়াশা নামান্তর ঘটায় সাজাঁর শিশিরের। টুব টুব টুব। ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা। ফোঁটা ফোঁটা। ফোঁটা।

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

দুপুর ১২টা ৪১
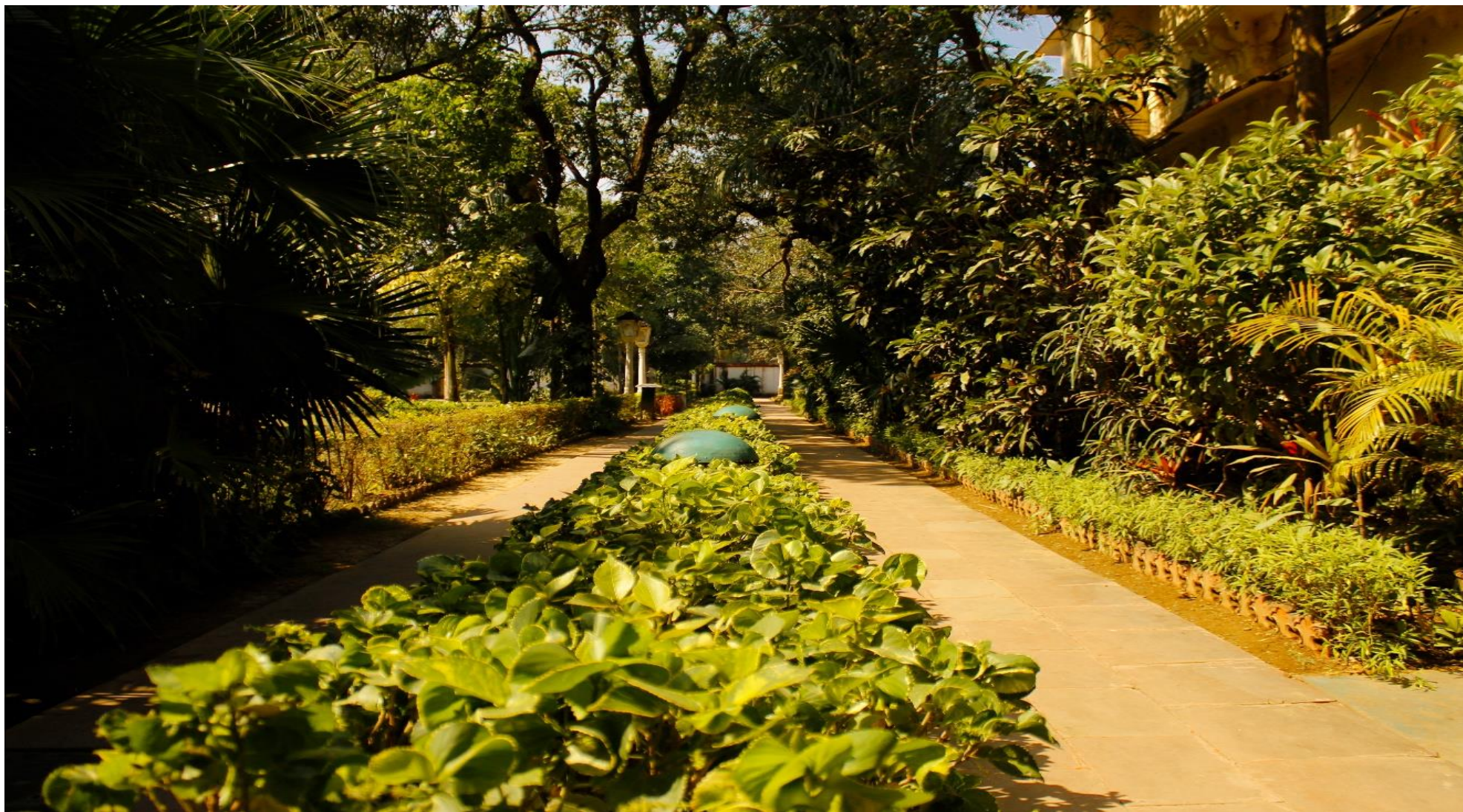
বাগানপাতা দেখেছ? হয় কি? আর তুমি বল সমগ্রতা!

এন্ট্রি ২৪

মাটির বুক চেরা। গোলাপি পাথর। চাষ হয় মাদকতা। জেয়পুর। একটা গোটা উপত্যকা গিলে খেয়েছে বাবলার জঙ্গল। মোবাইল টাওয়ারের সিঁথিতে অলঙ্কার দিয়ে যায় ধূসরতা। নরখাদক চিতার দাঁত। আমার রূদ্রপ্রয়াগ মনে পড়ে। করবেটের মতো কলোনিয়াল(?) ব্যক্তিত্ব হাজার হাজার বছর বেঁচে থাক। আমি মরুভূমির প্রান্তে হেঁটে যাব। গাড়ির কাঠামোতে ছিট ছিট দাগ। বুকে হেঁটে আসছে উদারতা। রঁদ্যার আগুন। পাথর মোমে জন্মদাগ বয়ে বেড়ায় স্নায়ু। আকাশবাণী-

"দোষ, দোষ, দোষী......কেউ সমস্ত তোমার মন ভেঙে

ছড়িয়েছে টুকরো টুকরো এই ক্ষেতে-মাঠে

কোনোটি জোনাকপোকা হল তার, কোনোটি ফড়িং

উড়ে উড়ে দিনরাত্রি কাটে।

কেউ লিখতে ডাকল না। খাতা খাতা উপন্যাস লিখে

শুয়ে পড়লে ট্রামের তলায়

বুক থেকে চাকা ঠেলে উঠে পড়ল লেখা সব----

লাইনের পাশে

কাটা সমালোচক গড়ায়।

আমরা তার রক্তমাখা মুখ থেকে শেষ হাসি পান করলাম

আমাদেরও গ্লাস রক্ত ভরা

ঠোঁট তুলে থমকে আছি দু-এক সেকেন্ড—

এক্ষুনি আরম্ভ হবে পানোৎসব, হুল্লোড়, মশকরা।

তার আগে জোনাকপাখি, কোন ফাঁকে তার আগে ফড়িং

ঢুকে এল? ধর, ধর, এক যোগে হুমকি খেয়ে ধরে দেখি,

মরা!

দোষ, দোষ, দোষী......কেউ কবির সমস্ত মন

একটু একটু করে গড়ছে, প্রতিদিন এই বসুন্ধরা।”[35]

জীবনানন্দের ট্রাম আমায় দিতির কথা বলে। চূড়া করে বেঁধে রাখা বাজরা। এক একদিন ভোরের জলছবি। ওমনি করে চুল বাঁধত দিতি। আমি তাতে রঙ ডুবিয়ে নিতাম। মোনালিসা পিছু ডাকে। আমি লিওনার্দোর অগ্নাশয়টা বোঝার চেষ্টা করি। চারটে বিচ্ছু। জোরে জোরে হাত। ক্লিপ ক্লিপ। তুড়ির ফাঁকে টানা পাখা। মাকড়সার মতো কাঁটা গাছ। দিতির চুল আমি খুলে দিতাম একটানে। দূরে হারিয়ে যাওয়া রাস্তার মোহনার মতো বৃদ্ধা বাঈজী। বকর বকর। লোকে ভাবে পাগল। সে তাল কাটলে উত্তমের মতো বলার কেউ নেই— "কিরে! থামলি কেন? বাজা!" রাজস্থান রক্তের দেশ। তার কর্ষনে পলি নেই, নিষিদ্ধ পল্লীর ঠোনা ফুটে ওঠে।

বৃদ্ধার নির্ঘুম চাকা কেশে কেশে ওঠে। শুকিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি আসে যায়। কৃষ্ণাঙ্গ চাবুকের দাগ লেগে থাকে কেবিনের গায়। বিবাহিতা দাঁড়ায় এসে পাশে। বোতল সামনে রাখি। শীতলা মন্দিরের গায় বাসা বাঁধে শ্যাওড়ার ঝাড়। হাজার বছরের সূর্য, একদিন এক বিকেলে তাকায় বোতলের চশমায়। বিবাহিতার হাতে পাত্র। যুগ যুগ যুগ। সাড়া জাগানো শব্দ। নিটের কবিতা। বিবাহিতা আবৃত্তি করে আমার প্রতিবিম্ব হয়ে—

[35] জয় গোস্বামী

যদি তেপান্তরের ঘাস শেষে
একান্তই যেতে হয় উড়ে

রেখে যেও,

পড়ার টেবিলে,
খালি কাগজের কোন চেপে;

একফালি
বিকেলের শেষ সূর্যের
জেল—
শেষের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ঠোঁটরঙ মাখা
একটা স্কচের গ্লাস
আর দুটো বরফের চূড়া
আলগোছে...

দিতি আমার জন্মদাগ। আবিরের রঙে কান্না ছলকে ওঠে। আমাকেও যেতে হবে। একদিন সমস্ত দরজার আগল খুলে যায়। এমনই একটা সূর্যাস্ত জন্মের পর জন্ম বেগার খাটে। বিবাহিতা আলতো চাপ দেয় হাতে। কাজলের কলঙ্ক তার গালে। রোদ জড়িয়ে ধরে শেষবার। আবার শুরুর আগে। ওকে ছাড়িয়ে পিছনে সময় দেখি চুপ। মাথা নিচু। চিবুক তুলিনি। কানে ফুঁ দিলাম জোরে। শিউরে উঠল ভেজা মুখের রেণু। আমার আবার রাণুর কথা মনে পড়ল। "সে কি এল, সে কি এল..."। সময়ের ভয় নেই। বুকে লাগিয়ে ফেললে গলতে থাকা কাজল আর ঠোঁটরঙের দাগ। সাদা জামায় শুকিয়ে ওঠা রক্তের মতো। আমি বললাম,"এটা কি হল?" সে বললে,"ক্ষয়ের কাজ চিরদিন অক্ষয়ের মূল্য দেওয়া। তোমরা বুঝবে না!" পাগলী! আমার থেকে বেশি সময়ের আবর্তে রয়েছে কে? মোনালিসা একটু দূরে। লিও আসে নি। ওর জ্বরের ভান পেয়েছে। আমি মোনালিসার চোখে চোখ রেখে বললাম,"ভালো থেকো!" ওর হয়তো এর থেকে বেশি চাওয়ার উপায় ছিল না। ও চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বললে, "আপনিও"! বিবাহিতা ওর মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিলে। এদিকে আর চাইলে না। আমি গ্লাস টুকু শেষ করলাম বিবাহিতার। এগিয়ে চললাম ঘাটের দিকে। ক্লান্ত সূর্যের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে।

সেই অপ্সরা। আজও চিনতে পারলে। ঝিলিক ঝিলিক নথ। "আবার এসেছ?" "আবার এসেছি।" "আবার আসবে?""আবার আসব।" ক্লান্ত পর্দার মতো দৃশ্যপট খসে গেল। নারকেলের খোলে করে যেন কেউ আবির ছড়িয়ে দিল আমার গভীর থেকে গভীরে। চারদিকে নাকাড়া বেজে উঠল। দ্রিমি দ্রিমি। আস্তে আস্তে ঘাটের তীরে জ্বলে উঠল প্রদীপ। দিতির নেশা আমার কানে কানে বলতে লাগলো,"খেয়া আসবে, খেয়া আসবে, খেয়া...খেয়া..."!

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

বিকেল ৬টা ৩১

এন্ট্রি ২৫

ঐ তার দূর চূড়া। তিনটে অতিষ্ট শালিক। খেয়ার অপেক্ষায় পা গেঁথে যাচ্ছে পাঁকে। তখনই বুড়ো স্টেশন মাস্টার ঘড়ঘড় শব্দে ঘাড় নাড়ে। বন্যা। আকাশ থেকে মরুর বুকে। নেমে আসে ময়ূরপঙ্খী। দৈত্যপুরী। আখেরনের সাবলীল ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। খেয়া আসছে। লাভাগলা কৃষ্ণচূড়া। বাঁশি। একটু একটু করে কালো দাগ এগিয়ে আসে। গুমগুমির শব্দ। অন্ধকার চপলার মতো ঢলে পড়ে গায়ে। খেয়ায় চড়েছি।

জননাঙ্গের রঙের শহর। অন্যঘাটের বুকে। দিতির সঙ্গে বেরোনো মনে পড়ে। ভাটিয়ালি। মাঝির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। নজরুল। বাঁশি নামানো পাশে। আমার দিকে চেয়ে বলেন, "অনেক হুঁশিয়ারি দিলাম ভাই। ভেবে দেখলাম অন্ধের দেশে তাকানোটাই পাপ। বরং খেয়া পারাপার করি। দিব্যি সময়টুকু কাটে।" মনের ভুল। আবৃত্তি করে ফেলি,"বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন..."। নজরুল বোবা চোখে তাকান আমার দিকে। ক্ষমা। ক্ষমা। এই নজরুলকে আমি চিনি। আমিই তাঁর স্রষ্টা। যে অহং-এর মোড়কে মোড়কে সংকল্পের রাঙতা, সেই অহং আবেগকে ধোপার মতো আছড়ায়। পাগল। দাঁত কিড়মিড়। সমাজ তাকে দিয়েছে কতটুকু ছোবলের পর ছোবল ছাড়া? নৌকোর পাটা দোলে। ঘটাং। তাকিয়ে দেখি অহং-এর বর্মের সিংহভাগ। লজ্জায় লাল। খসে পড়েছে। একটু খানি চোখের মাঝে লেগে। ভাবলাম, ব্লিচিং-এরও দাগ হয়। জল ক্রমশ সরে যাচ্ছে নীচে। কি? কি? নৌকো পাল তুলেছে। হাল তুলেছে। ভাসছে লালের পংক্তি ধরে। হাওয়ার দোলায় উড়ছে আকর্ষণ। রিক্ততার বেশে।

আমি কবির পাশে এসে বসি। ফসস্। লাল মুখ আরো পুড়ে ওঠে মুহূর্তে। বিড়ি ধরান কবি। সেই অস্তমিত বাস্তবের কাছা বদলে দেন নিজের হাতে। কাঁথাটা ভেজা। নৌকোর ছই-এ পায়ের চিহ্ন। কবি বলেন, "অনেক দিন হয়ে গেল ভাই, পারানি দেয় না কেউ! তুমি আমার জেলের গল্প শুনেছ?" ঘাড় নাড়িয়া বলি, "সে তো সবাই জানে!" নজরুলের অন্ধকার মুখের ওপর ধোঁয়ার নিস্তরঙ্গ তাজ। চোখ নাচিয়ে বলেন, "বাব্বাহ্! তা জেনে কি উদ্ধার হল? এখনও তো ঘানি টানছ। শুধু শুধু কবিতার একটা আবেগ হাতছাড়া..."। "তা, বলুন না, শুনি!" একটা কাঁচা খিস্তি শুনে মুখ তুলে দেখি। নজরুলের অন্ধকার ছায়া সরে এসেছে খানিকটা। সেখান থেকে উঠে আসছে একটা অবয়ব। পুরন্দর ভাট। "তোর সাধের পোষা ঢ্যামনা রে! যখন বলবি বমি করতে হবে? তখন ফণা ছিল কোথায়..."! উত্তর নেই। আমি মুখ নামাই। কাঁচা খিস্তিরও পাঁচালী হয়। আমি বাঁশিটায় ফুঁ লাগাই। বেশ মাথুরের রঙ লাগে।

ক্রমশ এগিয়ে আসে আলো। আমার নাব্যতা কমে। এক গোছা তারে বিজলী জ্বলে ওঠে ছই-এ। দিতি মাঝরাতে এমনি করে চাইত। টেবিলের পাশে ডাস্টবিন। উপুড় হয়ে পড়ে থাকত মুখ ঢেকে। গুন গুন। সনৎ সিংহ। "কে আমারে বলতে পারে রংমশালের মশলা কি..."। পৌঁছে গেছি প্রায়। শিমূলের মতো ফাটে কিছু। উত্তেজনার জোৎস্না হয়। আজও সাধনা রাস্তায় লেগে থাকে। অজন্তার মৈথুনের মূর্তি দেখে ডুকরে ওঠে সৃষ্টির বিধবা। বাস্তবের অধিবাস্তবতা কাটানোর জন্য। আমি শেষবার নজরুলের সঙ্গে ভাব জমাতে যাই। সূর্যের সংস্কৃতি তাঁর মাঝ সিঁথিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাবরির পরতে পরতে দূর জমে উঠেছে ঘন থেকে আরো ঘন। নজরুল আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। অভিমান। আমার ঝাপসা লাগে চারদিক। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে নজরুলের কণ্ঠ—"অনেক ছিল বলার যদি সেদিন........."

ডটের পর ডট। ডটের পর ডট। ডটের পর ডট। এভাবেই এক একটা মহাকাব্য গড়ে ওঠে। কালিদাস জানতেন। মাইকেলও জানতেন। জেনিভার জেনে ভাঙার ক্ষমতাকে মূর্খামি বলে না, সাধনা বলে, ছোট্ট করে, সাধনা...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

সন্ধে৭টা ৪৮

দোলে দোলে মম তনু নাওয়েরই অধীনে, ডুবিয়ে পসরা মোকে নাবিক করিলে শ্যাম, পারানিতে সুর দিও দীনে

এন্ট্রি ২৬

নীচে দাঁড়িয়ে মাথা তুলি। তা নাহলে মানবিকতা ভয় পায়। সোনার দূর্গ। সপাং। কোথাও চাবুক। হ্রেষাধ্বনি। আমার দুপাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাবার শব্দ। একটা হিম শীতলতা। আর কোনো আলো নেই অনুভূতির। দৈত্যপুরী। তিন কোনা পরোটার মতো পোড়ার দাগ গায়ে। ছন্দ। নাচের আওয়াজ। যন্ত্রদানবের পিঠে ধুলোর প্যারাসুট। আলোচনা। মৃতদের বাজারের তাড়া নেই। বৃত্তাকার সিঁড়ি ধাপের পর ধাপ। এভাবেই চলার কথা সংস্কৃতির। কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথ। ভাঙার আনন্দে গড়ার স্রোতে ঢেউ। একটানা ঘুঙুর কাঁদে। আমার পাশের হাওয়ায় দোল দিয়ে যায় অক্ষমতা। শিরশির। সরে গেল একটা গিরগিটি। দেয়ালের গর্তে। পা এগোয় না। দিতির ছায়া ডাকে। আয় আয়। ছায়ারা কতটা সত্যি? শরীরের থেকে তার কাপড় বেশি কি?

পায়রা ওড়ে। ঝটপট ঝটাপট। পুরীর গায়ে জানলা ব্রণর মতো। ধিকি ধিকি। আলো বাড়ে। আলো কমে। আলস্য। নাচের মজলিস। কত জন্ম এভাবেই ফোটে। যৌনতার সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ হয়েছিল নাচঘরে। পাকা দেখা। তারপর দৈত্যের ঝাপটায় অন্ধকার উষ্ণতা দিল ঢেলে। তখন থেকেই আলো মুখ ঢেকে ঘোরে। পাছে তার চুনকালি নাচঘরের আয়নায় দেখা যায়। ক্যাঁচ করে লোহার দরজা কাঁদে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় প্রহরী। মাথায় উল্কি করা,"যেতে নাহি দিব"। শিশুর এ আকার দেখে আমি চমকে উঠি। পাহারার ইতিহাস বৃদ্ধ। অতিবৃদ্ধ। আরামের চক্রবূহ্যের মতো ঋজু শিশ্ন তার নেই। অভিমন্যু কে? তার নাম মনে রাখে নি অশ্বত্থামার মণি। ঝলমল। আলোর প্রতিক্রিয়া। দৈত্যপুরীর বাইরের সে কাঁপে থরো থরো। আবার যদি চরম মুহুর্তে নিভে যায়? সে অনুভূতি দেখার চেয়েও বেশি দেখার। শোনার চেয়েও বেশি শোনার। পার্থিব কান্নার বুকে মড়ক লাগে। শকুনশিশুর অনুকরণ করে মৃত্যু। প্রহরী হাতের

বল্লম নিয়ে পথ আগলায়। নীরব উচ্চারণ। আমি সাদা জামার দাগটুকু তুলে ধরি। রক্তের মতো। সময়ের উপহার। প্রহরী ভাবে আমি মৃত। মরা ছাগলের মতো ঘোলাটে আমার চোখে কাকের দৃষ্টি এসে মেশে। দ্বার ছাড়ো। দ্বার ছাড়ো দ্বারী।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়। নেমে আসে অস্ত্র। পাথরের বুকে। টানতে টানতে সরে যায় প্রহরী। বিশ্বের বাণীতে বীর্যের দাগ লেগে থাকে। এভাবেই। কাপুরুষ আর মহাপুরুষের ভেদ রাখেন না সত্যজিৎ। মঁপাসা বেঁধে রাখেন ঘোড়া। আমি সাদা পাঞ্জাবিতে দেশলাই খুঁজি। গোল্ড ফ্লেকের রহস্যে চামড়ার দাগ লেগে থাকে। 'ঋজু'রাহোর মতো। ধোঁয়াশা আর মেঘ ঝুঁকে চুমু খায়। জানলার প্রদীপের ছটা তাদের উঁকি দিয়ে দেখে। সোনালী মাশকারা ঝলকে ঝলকে ওঠে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। জন্ম বাড়ে। মৃত্যু তবু পুরোনো হয় না এক তিল। তার সমস্ত অস্তিত্বের গাভীন দৃষ্টি নিয়ে দৈত্যপুরীর হা হা বুক তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে দুলতে দুলতে ঝরে পড়া এক দুটো পাতার আবেগটুকুতেই। আমি জানি ওগুলো মাটি ছুঁলেই ফিরে আসবে প্রহরী। অন্ধকারের অনাবিল সঙ্গ মেখে আমি এগিয়ে চলি ভূতের মতোই। বীরভদ্রের উদাসীনতা নিয়ে। আমার রক্ত আমার শিরায় ছড়িয়ে দেয় অন্তিম বোধের আশিষ। অথবা অভিশাপ। শীত আসছে, শীত আসছে, শীত আসছে, শীত আসছে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

সন্ধে ৮টা ২৯

দৈত্যপুরীর প্রত্যখ্যান তার জন্মের গোড়াতে চারায় নাকো! পাথর আর জলের মাঝে মাটিরও বলার কিছু থাকে

সিঁড়ির বুকের পাশে প্রোলেতারিয়েত অন্দরমহল বসে আছে, কোকিলের গলা কেটে রেখে গেছে রেলিং দালালে

এন্ট্রি ২৭

দৈত্যপুরী গিলে ফেলল। আমি-তে কী জানি কে থাকে! নিজেকে অচেনা। বাস্তু আর বাস্তু। টানা বারান্দায় দোল খায় বাসন্তী। দুমাস পরেই তার বিয়ে। সোনার টব। হীরের ফুলে গোলাপ গোলাপ গন্ধ যেন। তার ডালে শুক সারি কথকতা করে। আমার বাম দিকে চাঞ্চল্য। স্রোত জানায় তাঁরা একজন বিভূতিভূষণ, একজন আশাপূর্ণা। গণ্ডগোল একটা কিছু। আমি স্রোতকে বলি,"ভালো করো নি! জানার অভিশাপ বয়ে বেড়াতে তুমি পারো। আমি তাকে সইবো কি করে? আমার শরীর জুড়ে ঢেউ। যা শুধু জল-অচলের নামবিশেষ!" স্রোত আমার কপালে গাল রাখে। মিষ্টতার রাগ ছুঁয়ে বলে, "রাগ কোরো না। সমস্ত গতির গন্তব্য স্থিরতায়। পরিপূর্ণতা স্থিরতায়। আর স্থিরতার সম্পৃক্ততা টুকরোর থেকেও টুকরো করে ভাঙায়। ধ্বংসের সঙ্গমে জন্ম দেওয়া ছোট্ট একটুকরো গতির। দিতিকে পাওয়ার জন্য না হয় একটু জানলে আমায়!" আমার মুখে অন্য কেউ সায় দিলে।

এত নেশা! চোখ চলছে অন্য কারোর হয়ে। কান শুনছে স্রোতের গোপন কথা। হাত। চটাপট। দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি আবিষ্কার করলাম দেয়ালটা ভিতরে। কচ্ছপের মতো। হাঁকু পাঁকু । ওঠার শব্দ। সবের শব্দ হয়। তাই দৃষ্টির নিলামে শ্রবণ তুলে নেন রবি। পা চলতেই চায় না। স্রোত আমার হাতের প্রান্তে ইচ্ছে দিল। টান টান। এগিয়ে চলল বুক। এ রাস্তা আজকের সংকীর্ণতা নিয়ে বাঁচে না। মরুভূমির মাইয়ে পুষ্ট। জটিলতা নেই। ঠকাঠক। ঠকাঠক। ঠকাঠক। ছেনির পিছনে হাতুড়ির ব্যস্ততা। হাজার হাজার হাত। একি! দৈত্যপুরী তৈরি হচ্ছে। আমার হাতেও অস্পষ্ট লাঠির মতো একটা কিছু। স্রোতের আঙুল ছেনি হয়ে পেখম মেলছে এক একবার। আমি আরও এক গোপন জন্মের ইঙ্গিত পাচ্ছি।

শালবনের আলো মাখা ঝরাপাতার মতো বিগত কাজ। কাগজেই লেখা হোক কি পাথরে। হৃদয়ের ব্যপ্তি কতটুকু আজ? চৌকি থেকে চৌবাচ্চায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে। আর্চের ওপর আর্চ। স্রোতের ওড়না। আমার চোখ ঢেকে দেয়। থামের পাশ কাটিয়ে আমাকে নিয়ে যায় আর কেউ। "তোমার ঘরে বাস করে কারা..."! কে আগামী? কে অতিথি? চেনার পর্দায় অচেনা ধূলোর দাগা দেয় মরুভূমি। স্রোত এগিয়ে এগিয়ে যায়। আমি কাটা কাটা আকাশ দেখি। হাসির রঙে আকাশের ব্যস্ততা লেগে থাকে। আমি স্রোতের নিষ্পাপ হাসির পাশে বসি। ও আমাকে ঠেলতে থাকে। বসতে দেয় না। স্রোতের গন্তব্য সমুদ্র। কিন্তু থাকে সে নদীরই চিরকাল। পাথরের ফুলঝুরিতে ধাঁধা লাগে। বৈষ্ণবীর মন্ত্র মনে পড়ে।

অন্তর্নিহিতা। সেই। একজন মূলমন্ত্র জানে। আমি নিজেকে পরিচয় জিজ্ঞেস করতে করতে করতে ক্লান্ত। স্রোত আমার চুল গুছিয়ে দেয়। বলে,"দৈত্যপুরীর মতো করে নিচ্ছি তোমাকে। আটকিও না আমায়। দিতির কাছে পৌঁছে দেব আমি।" আটকাতে চাওয়াটাও আমার হাতে নেই। স্রোত গুনগুন করে,"চিত্রকর, তুমি..."! মৌসুমী আগুন লাগে আমার বুকে। আমিও দুলে উঠি। কে আমি? কে দোলে? শাক্ত নাকি সাংখ্য নাকি বৈষ্ণব নাকি বাউল? "ভাবি ছেড়ে গেছ, পিছে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাও নি॥ আমি অকৃতি অধম বলেও তো..."! কে জানে? স্রোত? নাকি নদীর চরাচর? আমার মাথায় জট। জটার থেকে নেমে আসে গঙ্গা। ভগীরথের মুখে আমি আবার সুর শুনি। দৈত্যের কাছে পৌঁছানোর চরম স্তম্ভ। আমি দেখি সাদাকালো চুলের এক প্রকৃত সর্বহারা নারী। তাঁর ঠোঁটে অনাদির আওয়াজ আমার মাতাল চোখে ধূলো ছোঁড়ে। আমি না। আমি না। কাঁদে অন্য কেউ। স্রোতের ঠোঁটের সঙ্গে ঐ পুরু ঠোঁটের বড় মিল। গুনগুন করছ ওঠে অস্তিত্ব—"তাই ঝড়ের কাছাকাছি, এই কাতর বিবরণ..."..........

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩১শে অক্টোবর ২০১৮

রাত ১০টা ৪

শহরালু কেশর-চিরাগী রেখা, চক্র গলার শিরা উপশিরার সঙ্গমে ক্লান্ত, তবুও ফেরার পথ হারানোর থেকে নমনীয়

তবুও ফেরার পথ হারানোর থেকে নমনীয়

আঁধারে ঘনায়মান কুঞ্জকুসুম দোঁহে, একপল কানু মোকে রাধা না চিনিল আহা, নিজরূপে হৃদয় তিতিল

এন্ট্রি ২৮

উঠলো ঝড়। ঝুম ঝুম ঝুম। চলায় ধাঁধা। এ কিসের শব্দ? ভাবার অবকাশ কতটুকু? ভুর ভুর। কর্পূরের গন্ধ। যাও মেঘ। আমি কোনওদিন উচ্চারণ করতে পারি না। ঝাপসা আকাশে সোনার দাগ লেগেছে। কই না! সোনাই তো। থামের অরণ্য। সোনার পাতা তার মুখে বুকে। ভারি। পায়ের ঘাম। মখমল। কয়েকটা গদি। ও কে! ধক্ ধক্। চোখের ভাষ্যে মিনার কাজ। সরসর। সরে যায় মাকড়সা। যুগান্তরের লালা তার গায়ে, পায়ে, আশ্রয়ে। এ কি নাচঘর? স্থির। আমি স্রোতের হাত চেপে ধরি। ধরি না। আমি চাই। পারি না। চাইছি না। ঝুর ঝুর। বালির সারেঙ্গির বুকে ওঠে কম্পন। মচ মচ। কেউ পাশ ফেরে। ঐ চোখ! "ও কি ভুলিবার ধন..."! জগন্ময়ী গুনগুন ভাসে। দানা বাঁধে নীল। গোলাপির আগে। গোলাপি? শহর। তার দান নেই! দৈত্য? দৈত্য! দৈত্য। ছন ছন। হাতের তুড়িতে ছুটে আসে ঘাঘরা। ও চাউনি সহ্য হয় না কেন? ঐ পেশীবহুল বুক। খাঁচার মরণকথা। মরি মরি! স্বর! মেঘের কম্পাঙ্ক। "ওকে নাচতে বলো! দিতির খোঁজে এসেছে। দিতির অবহেলা ঠেলতে হবে। অহং-এর টুকরো এখনও ঐ বুকে। এই দৈত্যপুরী অপবিত্র হতে দেব না আমি। স্রোত। ওকে নাচতে বলো।"

গম গম। গলায় কাঁপে মহল। শিরদাঁড়ার নিভৃতে মোমের মতো ছুঁয়ে দেয় স্রোত। আমি গালে হাত রাখি। অজান্তে। রাখি না। স্রোত। ব্যকুলতা। ঠনঠন। ছিটকে পড়ে সোনা। পেয়। তবু পিপাসার পাশে ম্লান। আমি বুকে হাত রাখি। চমক। একি? চমকাই না। স্বাভাবিক ভাবেই অস্বাভাবিকতা আসে। আমার পরনে ঘাঘরা। বুক ভারাতুর স্তনে। স্তন দুধে। নেশার মাঝে রক্তে নেশা ধরে। চকমকি। কাঁচ। হীরে। চেতনার স্রোত আগলে স্রোত ভরে থাকে। স্রোতের ঠোঁটে ডুবে আসে ঠোঁট। অনুভূতি। তলোয়ারও আছে। কি? কি চাই? কি হয়?

কি হবে? একাধারে স্রোত আমায় আমি থেকে উভগামীর সংজ্ঞা দিয়েছে। সমস্ত ম্লানতা ধীর। চলকে ওঠে কলসি। মা। বাবা। সংসার নেই। আমি শুধু প্রেম। আমি প্রেমের লিঙ্গ। ঝুম ঝুম। আমারই পায়ের সুর। ইদস্ কে? ইদং কি? অহং তার শত্রু? দৈত্য যেন শুনতে পেলে। কৃষ্ণের মতো হাসি। উফফ্। জ্বলে যায়। গলার নীচে নীলকণ্ঠের অস্তি। স্তন রোমাঞ্চিত। গঙ্গোত্রীর গোমুখ। ত্রিবেণী হয়ে মেশে। দৈত্য বলে,"অহং কোনওদিন তোমার শত্রু ছিলনা। অহং-এর ব্যবহার তুমি শেখো নি। পাথর কুঁদে মহল হয়। ইদং-কে শিল্পের রূপ দিতে অহং-এর ছেনি হাতুড়ি লাগে। সাবলিমেশনটা একটু বোঝো হে! নাচো অজ্ঞাত। না নাচলে অভিশাপের স্খলন নেই।"

নাকের নথ। স্খলন হয় অন্যকারও। পূজোয় ফুলের আরতির মতো। টুপ টুপ। অন্দরমহলে। স্রোত আমার শব্দ ছুঁড়ে লেয়। দুলদুল। দুলুনি। পা ছুঁয়েছে। আমার শরীর? কার? কোথায়? কতটুকু অসাধ্যের আলোড়ন? দিতির কাছে আমায় পৌঁছতেই হবে। আমি নাচি। নাচি না। নাচে অন্য কেউ। আমি কোনওদিন নাচ শিখি নি। দিতির নাচের পা। স্মৃতির পাথর। আমি খেয়াল করি নি। আজ করি। পায়ের চাপ। নাচঘর কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চে। আমার বুকে ঢেউ। প্রথমবার। স্রোত আমার পায়ে পায়ে নাচে। আমরা গড়িয়ে পড়ি স্তনের থেকে শিশ্নের গভীরে আরও গাভীন বুক নিয়ে। সমুদ্র মন্থন। কে ওঠে? সুর আর অসুরের জন্মযোনি কেন এক? একের মতো! একের নামতা। জীবন আসর জুড়ে থমকে দাঁড়ায়। যাকে গুনের স্বাধীনতা দিই, ভাগটুকু সে কামড়ে শুষে অধিকারে নেয়। আমি মৃত্যুর কোলে নাচি। আমার টুকরো হয় না। আমি শিব। আমি সতী। কে? কে? অন্ধকারে কার অবয়ব। জগন্ময়ী কণ্ঠ কানে আসে। "রমনীমোহন"!

ঝংকার। বীণা। রুদ্রবীণা। নাকি বুকের? নারীর অস্তিত্বের? ঝাপসার মালাখানি ম্লান হয় না কখনও। কতজন আসে যায়। সাদা কালোর পায়ুরেখার মাঝে ঝাপসা তার ধূসরতা নিয়ে লেগে থাকে স্থির। শক্তি শাক্তে মিলে যায়। মনের মানুষ পাওয়া কি এই? সাধনা।

একতারার সুর। কখনও খোল। কাশেম মল্লিকের কণ্ঠ। "ওগো বেদরদী ঐ রাঙা পায়, মালা হয়ে কে গো..."! মিনার কাজে পালিশ লাগে। তবে তার আগে ছিঁড়তে হয় বুক। আমার ঘাঘরার ওপর চোখ রাখে কাঁচুলী। পায়ের তালে অনাবৃত। চটাপট চটাপট। হাততালি পড়ে। পয়সা ছুঁড়ে দেয় মহল। আমার আর স্রোতের গায়। হ্যাঁচকা টান। ছিঁড়ে যায় বুকের বাঁধন। দৈত্য হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে স্রোত আর আমাকে। চেপে ধরে আমার কণ্ঠ। আমার গলায় রোঁয়ায় বিশ্বাস ঘাতকতা। উফফ্। একি বিষ? একি আগুন। জহরব্রত। ডুবতে চাওয়া। দৈত্য একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর শ্বাস ফেলে শ্বাসের ওপর। গম গম করে ওঠে ঘর। "কীভাবে?" একপর্দায় ছন্দপতন বিশ্বের। উড়ে যায় কালো প্যাঁচা। জীবনানন্দের ইঁদুরও কি হাতঘড়িতে অপেক্ষা করে থাকত প্যাঁচার? ক্লপ ক্লপ। ভেঙে যায়। ভাঙে না। অস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্ব। আস্তিক্যের আদলে আস্তিক্যের ঘোমটা জোড়া। জড়িয়ে জড়িয়ে আমি গেয়ে উঠি,"এই করেছো ভালো নিঠুর হে..."! ছ্যাঁকা। সিগারেটের কড়া গন্ধে ভরে যায় সভা। আমার দ্বিগুন দূরত্বে স্রোত। আমি আঙুলটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসি। ধোঁয়াশার বুকে চিল। সাঁ । শব্দ । আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দৈত্য অন্ধকার ঘরে। অশ্লীলতার জাজিমে ডুবে আসে দুনিয়া। অন্ধকার আমায় ঠেলে দেয় স্রোতের বুকে। ধীরে ধীরে আরও গম্ভীরতার বেদীমূলে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

১লা নভেম্বর ২০১৮

সন্ধ্যে ৭টা ৩৭

টি কেটে সোনালি পিরালি একা স্তম্ভনের ঝিরঝিরি যার নাগাল পায় না, একটা পিচ্ছিল খননও লাগে তায়

নাচঘরে একা আমি উভলিঙ্গ ও স্রোত, বসন্তের থেকেও ভারী অধরতা ঘনায় নিঃশ্বাসে

বিহারকুয়াশাধূপ সাগরতীরতঘন রচে হরিহরকামীশয্যা / সাধকসলিল ভণতই তুয়ামূলব্যাপীতৃষ্ণাগরলতঃ প্রবজ্যা

জয়দেব আত্মরতির কবি, কৃষ্ণ জানতেন! তুমিও কি জানো কিছু তবে?

এন্ট্রি ২৯

তফাৎ যাও। তফাৎ যাও। রিন রিন। রিন রিন। মেহের আলী থেকে রবীন্দ্রনাথ। চিৎকার করে ওঠেন দেশবন্ধু। রবীন্দ্রনাথ শোনেন না। "উমা-শঙ্কর বিহার পর্ব"! মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসেন ভারতচন্দ্র। ড়সসসস্। কানে লাগে। বিরক্ত ম্যাকলে মিনিটের শক্তিশেল ছাড়েন। এক আলমারী সংস্কৃত বই পুড়তে থাকে। কালিদাসের চামড়ায় ফুটে ওঠে মোহর ছাপ। ফারেনহাইট ৪৫১। ক্রুফোর পাশে ফস করে ওঠে দেশলাই। ধরান ব্রাডবেরি। স্কচের গ্লাস। গুবগুব গুবগুব। কিছুটা রাষ্ট্র পড়ে পেটে। লিও-র কান্নাটা আরও জোরদার হয় এঞ্জোলোর থাপ্পড়ে। জয়দেব উদাস চোখে মাঠের দিকে তাকান। তার নেমপ্লেটের পাশে শ্যাওলা পড়েছে। বাগানের দেয়ালে নোনা। কর্পোরেট এসে রোজ শ্লীল-পেচ্ছাপ করে যায়। ভালগারিটির ব্লিচিং-এও আজকাল গন্ধ যায় না। রবীন্দ্রনাথ বিকৃত। বায়রনের ভঙ্গিতে তোলা আঙুল কেটে যায় আখের কলে। "সত্য করে বলো মোরে..."! এগিয়ে আসে সহজিয়া। চর্যার দেহ। এগিয়ে আসেন কালিদাস। এগিয়ে আসেন বাৎসায়ন। গ্রীস থেকে রোম। রোমকূপে রোমাঞ্চ। মিশর, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা। বজাজ বলেন অজন্তা অশ্লীল। বুক দিয়ে মূর্তি আগলান নন্দলাল। সমরেশ, বুদ্ধদেবের পাশে খালি পায়ে এসে দাঁড়ান রামকিঙ্কর। ঐ পুরু প্রিমিটিভ ঠোঁট। স্রোতের মতো। ভাস্কর্য। ভিড় বাড়ে। অন্ধকার।

ঝুপ করে নেমে আসে। কুয়াশা। বন্ধ ঘর। বাইরে থেকে তালের রেশ আসছে। মুজরো। বাঈজী নাচে। বৃদ্ধার পা। গঙ্গার মতো শাখানদী, উপনদীকে পবিত্রতা বিলিয়ে দিতে থাকে। অন্ধকার আলোর সতীন। দৃষ্টির পরকীয়া। আমি অবয়ব দেখি। ঘাড়ের খুব কাছে। স্রোত? নাও হতে পারে। অন্ধকারই তার পরিচয়। আঁধারিনী পা। ছোঁয়ায় চমকে ওঠে নারী। বাজনার স্বরে ডাকছে অস্বাভাবিক। আমার

ঠোঁট। পাখি। চন্দ্রবিন্দু। উফফফ্। আলতো কামড়ে শিউরে উঠে পাতা ঝরায় আঁধারিনী। বন্ধ দরজা। বন্ধ্যা নয় ঘর। জাজিমের দোলা। ভিজে ওঠে অন্তঃসারশূন্য দোলক। খড়্গের মতো অস্ত্র। ব্যবহার। অহং-এর ব্যবহার। দৈত্যকণ্ঠে উল্লাস কানে আসে। আমার স্তনের ভাঁজে পদ্মের শিশিরের মতো ঘাম জমে ওঠে। দাঁতের দাগ পরিয়ে দেয় মেখলা। আঁধারিনী নাকে অস্তমিত নাড়ির টান। পদ্মের পাঁকের দিকে নামতে থাকে আঙুল। ঝর্ণার আগে বৃষ্টির অপেক্ষায় চাতক। পিঁপড়ে। সারি সারি। খাবারের ভাণ্ডারে এসে দাঁড়ায় নগ্ন শিব।

আমার নারীত্বের মোলায়েম স্তন আর ঋজু শিশ্নে আঁধারিনীর অঙ্গারের ছোপ পড়ে। অন্ধকার শীৎকার নেয়। ফিরিয়ে দেয় কালসিটে। নখের দাগের মতো মেঘ। কালো রক্তের মতো অশ্রু নামে। আঙুলে শব্দ হয়। আঙুলে জীবন থাকে। উত্তাপ জমাট বাঁধে। নিতম্বের স্ফিত বুকে মহাসাগরের গভীরতা। অদৃশ্য । অর্ধনারীশ্বর। অথবা হরিহর। আচমকা। চক চক। মৃত্যুদণ্ড। সরীসৃপের জিভ। আমি স্বর্গের দিকে উঠতে চাই। নরক উঠে আসে। ভার্জিল মনে পড়ে। বন্যা। নোনতায় জ্বালা ধরে চোখে। মুখে শব্দের স্বাদ শুধু। দুই উপনদীর মোহনায় হারিয়ে যায় নবকুমার। জন্মের পর জন্ম। কপালকুণ্ডলার চুল। আমার পিঠের স্রোতের ঢেউ। আমার বুকে অন্তঃক্ষরা পিচ্ছিলতা। আঙুলের চাপ পড়ে। হ্যাঁচকা টানে উপড়ে আসে আমার নরম স্তন। আঁধারিনীর অধিকারে। বিজলি। মেঘের বুকের ভাঁজ দপ করে জ্বালিয়ে দেয় কুচবরণ কন্যা। চুলের চিতায় আহুতি নেয় সংজ্ঞা।

দপ। দপ। একে একে আলো জ্বলে ওঠে ঘরে। চারদিক এখনও ঝাপসা। সমুদ্রের পর্বত ঢেউ। কলাপাতার ভেলার নীচে বেহুলার চোখ ভাসে। আমার বুক মুখ ভরে তখন পুরুষ এসেছে দ্বারে। জর্জের খালি গলা,"একি পুলক বেদনা..."! ঘরে প্রতিধ্বনি। ঝাপসা এখনও। দেয়ালে মহারাজ দেখছেন। রাণীকে! রাণী কে? দিতির আদল! আমি দিতির কানে মুখ বিছালাম। জাজিম পায়ের বাণী চিরদিন বুক

পেতে নেয়। কম্পনের চূড়ান্তে এসে শীৎকার নীরবতা খোঁজে। লাল হয়ে ওঠা ঠোঁট তার রঙ সুদে খাটায় বুকে। আমি ভিক্টোরিয়াকে ভেজা লুঙ্গীর মতোন ছুঁড়ে ফেলি। ত্রিভুজের আলম্ব রেখায় মার্বেলের রঙ ধরতে চায় । সরলরেখার ভার। নেমে আসে সূর্যাস্তের বুকে। বৃষ্টি নামে। কালিদাস বৃষ্টির শব্দ তুলে নিয়ে দিতির গলায় পরিয়ে দেন একে একে। এক উভগামী আর এক নারীর শরীরের ওমে পরম হয়ে ওঠে। ডিমের আস্তরন ভাঙে। মিটিমিটি হাওয়া মাখে পুরুষ। প্রকৃতির কোলে। পাখির ছানার মতো ঠোঁট পাতে নগ্ন শরীর। দুই। দ্বিত্বে ফেরে নুড়ি। পুরুষাঙ্গ স্নেহময় হয়ে ওঠে। দুহাত পেতে গ্রহণ করে দুজন দুজনের কাছে। একতারার তার টানটান হয়। সুর ওঠে থেকে থেকে। দিতি খুলে রাখা আঁচল টেনে আমার মাথার ঘাম মুছে দেয়। আমি দিতির স্থবিরতা দেখি। সূর্য ফের ডুবে যায় পাহাড়ের খাঁজে। আস্তে আস্তে শীতলতা। নামে। আমার শীত শীত করে। ঘট। খুলে যায়। হাট দরজা। আমি নগ্নতা নিয়ে এগিয়ে এসে শূণ্যতা অনুভব করি দৈত্যপুরীর। অনুভূত হয়, পোষাকের শূণ্যতা নগ্নতার সংজ্ঞা দেয় না। অস্তিত্বের শূণ্যতা দেয়। আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দিতি। আমার মতোই। সম্মৃদ্ধ। আদরে ঢাকা শরীরে। আদরে নগ্ন মন......... দেয়ালের বন্ধ্যাত্ব গেয়ে উঠল রামকিরীরাগে,

“কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।

মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।

নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে।।

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।

ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জ্বলমুজ্জ্বললয় প্রিয় লোচনে।।

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।

মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে।।

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।

জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে।।

মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।

বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে।।

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।

রতিগলিতে ললিতে কুসুমখানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে।।

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।

মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে।।

শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।

হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিত কলিকলুষজ্বরখণ্ডনে।।”[36]

---

36 জয়দেব

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

১লা নভেম্বর ২০১৮

সন্ধে ৮টা ৪৪

চূড়ান্ত ট্রান্সের পরে অবসাদ গরুড় হয়ে নামে রমণাঙ্ক লেগে থাকা দেয়ালের পাশে
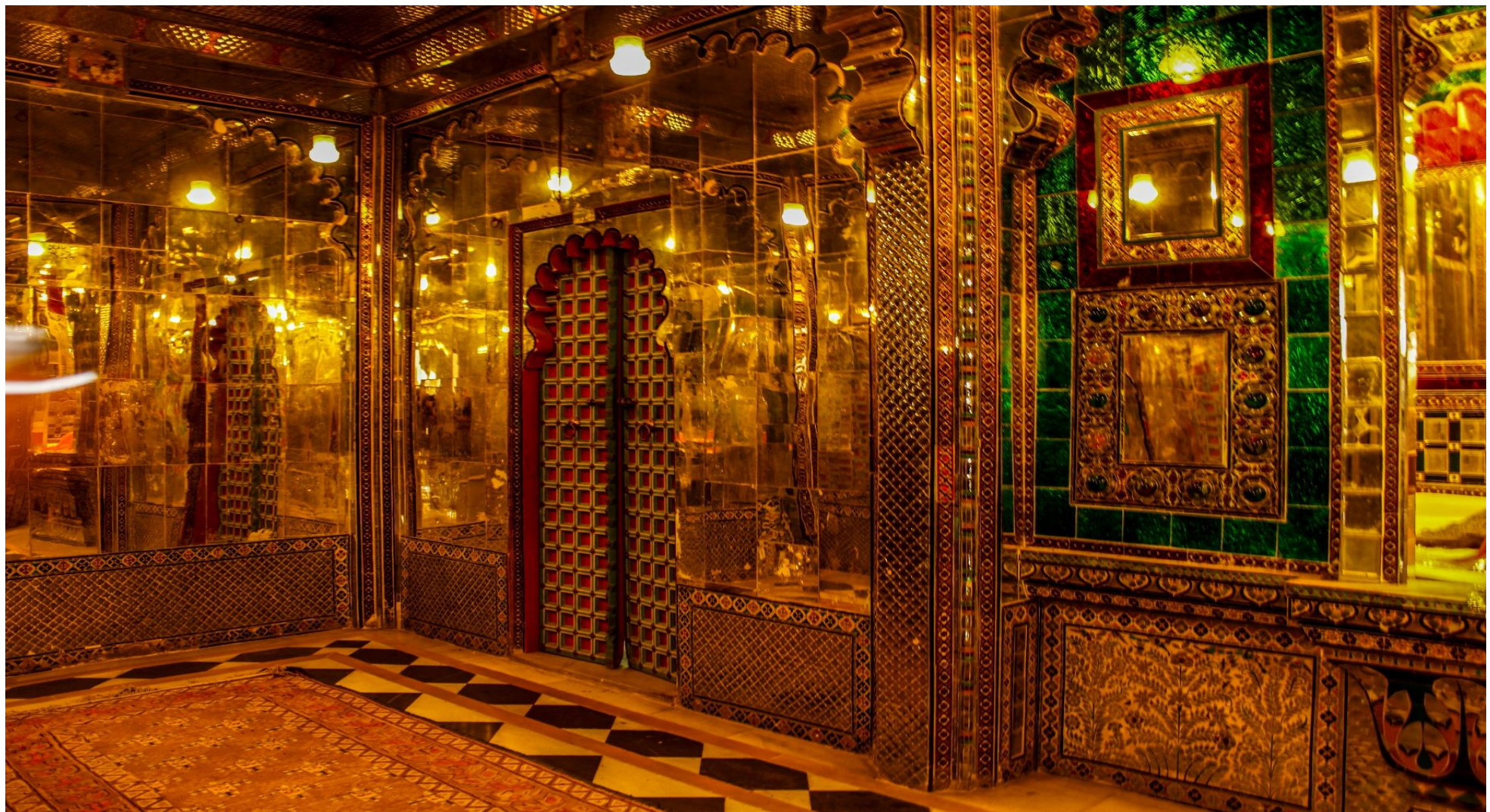
দরজা খোলার পরেও প্রতীক্ষা কাজল টানে, কাস্কেট পুড়ে আসা ফাল্গুনের সোনা রক্ত হয়ে ওঠে সেই চোখে

অ-কথার ছবি। হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন?

এন্ট্রি ৩০

খালি গায়ে গলা ঘষছে হাওয়া। ঝিম। ঝিমুনি গায় পা। রেলের লাইন। সোজা। দৌড় দৌড় দৌড়। ঝপাং। ঋত্বিক সমেত গাড়ি নেমে যায় দ্বিধার অবসরে। শিঞ্জিনীর আদলে একটা মেয়ে উঁকি দেয় দেয়ালের বুক চিরে। মনে হয় সূর্য। রেললাইনের ওপর শুয়ে আছে বিষ্ণুর মতো। কামরার কাঁচে ফুটি ফুটি। জাফরি আর মিনা শেষ পর্যন্ত মিশ খায় বরফের মতো। ঝুঝুম ঝুম ঝুঝুম ঝুম। হারমোনিয়াম। অভিজিৎ বসুর মাথা দোলে ডায়নে বাঁয়ে। "মেদিনীপুরের আয়না চিরন, বাঁকুড়ার ঐ..."! আমি খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। দিতির পায়ের শব্দ। স্নানঘর উঠে আসছে পরতে পরতে। স্নিগ্ধতার অপেক্ষা। ঝিলিক চোখ। কি বোঝে কে জানে। আমি তাকাতে চাইলেই নেমে আসে মাটিতে। খোলা গায়ে রোদ খেলা করে গুঁড়ো গুঁড়ো। গোল্ড ফ্লেকের সাঠ সোনালী ডিজেলের ইঞ্জিনের সাথে। ধোঁয়ার আকাশে আনন্দের কান্না অনাবিলতা খোঁজে।

গতি। টান। একক বাড়লে দুই বাড়ে। বাউল তাই ধীরেই চলে। দৈত্যপুরীর থাম। জন্মের নীরবতার ভার বয়। ঝগড়া। একচোট দেয়ালের মেয়ে। নিষ্পাপের পাপ ভেঙে আনে স্বর্গরাজ্য। ঘোমটা টানে অগভীর অন্ধকার। আমি দিতির নেমে আসা ঢেউয়ের অঙ্গীকার হাতে পরখ করি। অগোছালো। তাতে জলের গুছিয়ে রাখার রেশ। তবু। গোছানো অগোছালো ভাবে। এভাবেই শিকড় আসে। নাভি হয়ে ওঠে নাড়ি। চট ছট। চোখ বন্ধ। ছিটকানো কুয়াশা। দিতি ইচ্ছে করে! কপাল ঠোঁটের আদর খায়। যৌথ পরিবারের মায়ের নিজের জন্য রাখা ভাতের হাঁড়ির মতো। ওকে বলি, "যাবে না?" দিতি দূরে চেয়ে থাকে। দৈত্যপুরীর শিঙে আখেরনের সিঁদুর। ও বলে, "দেখো, পারানির নেয়ে-বৌ দোরের ওপারে বসে আছে। ঘাটে চলো না গো!"

নগ্ন দুই শরীরের ভাঁজ খোলে। গতি আসে। পায়ের ছাপ। এগিয়ে চলার আরক। দৈত্যপুরীর ছবি ছুটে আসে দেয়ালে দেয়ালে। রবির চক্রে শ্যাওলা। পিচ্ছিল। দড়ি বেয়ে ঝুল খায় ঝুল। অন্য শতাব্দীতে। ও আমায় দেখে কেন? এ বুকে কাগজ নেই আর। সই থাকে। অসংখ্য দলিল। প্রতিটা পুরুষের অথবা নারীর একটা করে হারেম থাকে। যেখানে চেতনার নিষিদ্ধ পল্লী শেষ। খামের ব্যর্থতা জুড়ে চিঠির প্রতিশ্রুতি। একদিন গলা ছোঁয় খোপ খোপ পাথরের শূন্য। গঙ্গার ঘাট। পোস্টার। পত পত। হাওয়া। পেতে বসে একদিন ছেড়ে যাওয়া একাকীত্বের স্মৃতি নিয়ে। কয়েক জন্ম খুইয়ে দিতিকে পাওয়া যায়। ছবি তাই উসুল করে প্রতীক্ষা। দামে। বিছানায়। চুলের কাঁটায়। আর জেনারেলস্ পেন্সিলের ধূপ ধূপ গন্ধে।

সর সর। সরে যাচ্ছে হাত। উচ্চতার শিহরণ নিচ্ছে কাগজ। আঙুল। এক থেকে দশে ঘুরছে চোখের সামন্ত। অন্য এক জন্মে আমি দিতি এঁকেছিলাম। ঝাড়বাতির জটিলতায় প্রদীপ ম্লান হয় না কখনও। নীচের দিকে নেমে আসি দুজনে। অহং কুকুরের মতো লেজ নাড়ে। বেল পাতায় চুঁইয়ে নামে মেঘফোঁড়ানি সোনা। সূর্যের চোখের নিচে গড়িয়ে যাওয়ার দাগ। অনেক দিন। দিতি কাচেনি সূর্যটাকে। মশারির দড়ি। জুল জুল চোখ। একটা উচ্চিড়িঙ্গে। বিছানা বিছানো রাস্তা। সাদা ধবধবে দৈত্যপুরীর দৈত্যশূন্যতা দিতি আর আমার শরীরে চাদরের মতো লেগে থাকে। আমার চোখের প্রকোষ্ঠে একটা আড়াই ইঞ্চি ফ্রেম। গর্ভে সোওয়া ইঞ্চি বর্ডারের একটা ফুলদানি। সাদাকালো ফুল আর দিতির ছবি মেখে আরাম করে খাচ্ছে একটা বাদুড়। ঝুপ ঝুপ ডানা। তাকাচ্ছে আমাদের দিকে মাঝে মাঝে। বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজছি আমরা। এ সেই বাইরে। যে পথ দিয়ে জন্ম নিচ্ছে জন্মান্তর আমি, দিতি, ছবি। যুগে যুগে। তালে তালে। কষ্টের ওপর কষ্টের প্রলেপে। অবদমনের শুক্রানুতে...

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৩ নভেম্বর ২০১৮

রাত ১১টা ৪৩

জানলাবাদুড় সব পায়রা হয়ে এল। কিছু ফাঁকের ওপর প্রান্তে কানাগলির অন্ধকার

গরুর চোখের মতো যে নদীর ডাকঘর গুরুপত্নীর খামে মেশে, তাতে ছিন্নশাড়িটুক এক বিচত্র আভরণ!!!

ফিরতি গেঁথে পাথুরে স্বাদ সবটুকু গান নিয়ে গেছে

এন্ট্রি ৩১

সিঁড়ির নীচে জানু পেতে রাখে সিঁড়ি। দুল। ছম ছম। কানের পায়ে শিকল দিল কে? নামার বারান্দায় কারাগার পথ। কাঁটা। চমকে চমকে ওঠে। সুড়ঙ্গ। প্রকৃতির পথ। দিতি আর এগিয়ে চলেছি। সংক্ষুব্ধ আবদ্ধতা ফুঁসছে। আঁশটে গন্ধের শুঁটকি বিছিয়ে চামচিকের সমাজ। উল্টো ঘূর্ণন। পাশ বালিশ। পেরিয়ে আসে পা। উত্তুরে হাওয়া নিরুদ্দেশে আসে। এই মাটির বুকে। পৃথিবীর যত পাথর সব রাজপুত্র বুকে রাখে। ডিমের মতো। কিরণমালার অপেক্ষায়। সুনীল হাতড়ে ফেরেন। নীরার থেকে শক্তি। বড়র কম্পাঙ্কে গভীরতা আসে বহুদূর। সুড়ঙ্গ প্রতিধ্বনি ঢালে—"......রাখেনি রাখেনি রাখেনি।" তেত্রিশ ছত্রিশ একঘেয়েমি। আখর থেকে প্রতিবন্ধকতার পথটা আবর্তের। দিতি ছুঁতে পারে। ঘাঘরার ঘায়ে ঘায়ে জড়িবুটির মূর্ছনা। ওষুধের থেকে মোরব্বার চাহিদা। ঘটি ডোবায় অহং। দিতি চু চু করে ডাকে। অহং লেজ নাড়ে।

এই দুই তিন। ছুব। তারার পিঠে তারার খই। দেয়াল হাজিরা দেয়। কালো মোষের পিঠে আড়মোড়া ভাঙে অনন্ত। দিতি আমার কান কামড়ায়। বলে,

"অবশেষে

মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে

যাত্রা তার হবে অবসান;

খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।"[37]

চমকায় স্থিতি। এই তবে! খস খস। মুক্তির বুকে বিশেষের দাসখত। বন্ধন আর বিচ্ছেদের অতি ধীর স্তব্ধ রাত। এক একটা নক্ষত্রের মতো ঝরে জন্মায়। জন্মিয়ে ঝরে। এগোনোর কান্না। কারোর পাতে পড়েনা। ওর জন্য বুফের খানসামার একাগ্র প্রতীক্ষা। রোলা বার্থ আর বনফুল হাত ধরাধরি করে হেঁটে যান। লেখক আর পাঠক। দুজনের দুহাত ধরে একফুটি মৃত্যু টলায়মান। জুতোর পদ্য। পঁ পঁ। আমি শিষ দিয়ে ফেলি। মৃত্যু একগাল ফোকলা হাসি নিয়ে ফিরে তাকায়। শুধু নেওয়া যায় না চোখ। জরা আর শৈশবের পাঠশালা একই। যৌবনের ভারে বুকের সঙ্গে প্রখরতা মেলে দৃষ্টি। খাসমহল পেরিয়ে। ধুলোর আঘ্রাণ নিই আমরা।

অন্ধকারের ছাদ। ফট ফট ফট ফট। স্টিলশটে ঢুকে পড়ে বাদুড়। ক্রুফো বিরক্ত হন। গুঁফো নাজিনোভাও বিরক্ত হন। পেনরোজ অ্যানুয়ালে একটা মোম জ্বালিয়ে রেখে গেছে কেউ। গতজন্মে। জন্মে জন্মে। বারবার। ছোপ ছোপ দাঁত। হাঁ বিছিয়ে রাখে গন্তব্য। টুং টুং। পিয়ানোর বাজনা আসছে শেষ খেয়া থেকে। সুড়ঙ্গ রাতের বাসর। দিন অচ্ছুত। আমরা তাই পায়ে পায়ে তারা মেপে চলি। কামিনীর পায়ে। ঝর ঝর। ঝর্না। সাদা মোম গালিচা। সুগন্ধ সাপের মতো পা বেয়ে ওঠে।

ঘোষণা। মোহের নীলকুঠি। শৈলবাণী বৃষ্টির কাছাকাছি। "বিদায় পথিক। প্রান্তে এলে। শুভেচ্ছার বরফ দিতে ভুলো না! বেলা পড়ে এলে বিদায়ের স্কচে নাহলে রক্ত জমে ওঠে না।" আবার ক্যানভাস। ছিঁড়ে খুঁড়ে দূরে কোথাও ফেলল কেউ। আমি দিতির হাতে চাপ দিলাম।

---

[37] রবীন্দ্রনাথ

আখেরন। রণের শেষ তীর্থ। দৈত্যপুরী পিছনে। বহুদূর। এভাবেই মোড় আসে জীবনের। অন্ধের হাত। শুঁড়ের পরে লিঙ্গের ঠাওর পায় না শব্দ। বালির সমুদ্রে ঘাসের শ্যাওলা ধরছে। ক্লান্তি ঠেলে ঘাটের পথ। বেয়ে চলে দিগন্ত। আমাদের পদ-পদ্য কাঁকড়ার মতো ঘুরে ঘুরে আলপনা দেয়। এখন পাহাড় সবুজ হচ্ছে ধীরে। দূর থেকে আসে খেয়ার তরঙ্গ। আমি স্বাভাবিকের মতো দৌড়ই। পড়ি। দৌড়োই। একটা পুরো জীবনের সহধর্মিতা দেখে বালি। বালির ঘাস। মুচকি মুচকি হাসে। সে হাসিতে চিহ্ন রাখে চিরদিনের অপরাহ্ন। ঐ টুকুই থাকে। ঐ টুকুই থাকবে। জীবনের চাঞ্চল্য দেখে প্রকৃতির নিভৃত হাসি। যার মহাকাব্য লেখার জন্যেও জীবনের দুটো আঙুল চাই। শুধু মাত্র দুটো। এর নাগাল শাজাহানেরা পায় না কোনও দিন। পায় নি কোনওদিন। পেলে মমতাজ মিউজ় হয়ে উঠবে। কবর নয়।

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৪ঠা নভেম্বর ২০১৮

সকাল ৯টা ৪৪

উৎসের থেকেও দামী কিছু প্রতিফলন বুদ্ধের কারণ পিয়েছে

বিদায়ান্বিত (১)

বিদায়ালোকিত (২)

জীবনের পথে চমকে পিছনে দেখি পদরেখ নাই, পদরেখ নাই! কেন? আহা! কৃষ্ণের পদযুগে তীর বিঁধেছিল

এন্ট্রি ৩২

শেষ খেয়া। প্রশ্ন করেছিল। করে আসছে বাউলের নাভির কাছাকাছি। উত্তর নিরুত্তর। ঋত্বিকের চশমা। ধূলোমাখা। পদদলিত। একা একা সূর্যাস্ত দেখে। এক একটা যুগ পেরিয়ে জন্ম আর মৃত্যু চুমু খায় পরস্পর। সেখানে চেতনার মাছবাজার নেই। ছিল না। কোনো দিন। চাদরে ঢাকা দুটো পা। লাল আলতা। শুয়ে আছে অবজ্ঞা। ক্ষুদসেদ্ধর গন্ধ আসে। নালারও তৃষ্ণা থাকে। আখেরন আর তিতাসে জড়িয়ে যায়। চ্লক চ্লক। মাড় চাটে অহং। আসলে চেতনার চর্বণে অবচেতনের স্তন্য ফেলে এসেছে মানুষ। মরুভূমি পাশে খোলস দেহ সেজে বসেছে কিছুদূর। তাই রাত কাঁদে প্রতিরাতে। অন্ধকার জমে না সভ্যতার আধিক্যে। ধীরে ধীরে কাঁধে বোঁচকা ফেলে বিদায় নেয় ছড়া। মায়েদের আঁচলে তার আর গন্ধ লেগে থাকে না— "এ বলে খাবো খাবো..."! খাওয়াই সার। লবডঙ্কার ঢেকুর ওঠে না। গলা জ্বালা। বুকে ব্যথা। বদ্যি বলে, "চাটনি খান।" চাটনি চাখতে গিয়ে শুক্তো লাগে দাঁতে। থুঃ থুঃ। "ওমা! মায়ের আদর ফেলতে আছে?" ঘোমটা টেনে হাঁ হাঁ করে ওঠে বিস্মৃতি। আমি নামতা আর মাতৃস্নেহে গুলিয়ে ফেলি আবার। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে পাটা পেতে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ঋত্বিক। "কেন চেয়ে আছো গো..."!

ফেলে রাখা পাটাতন বায় ভেজা ধূলো। দিতি একাই এগিয়ে গেছে আগে। আমি ঋত্বিকের পাশে গামছাটা নামাই। আকাশের জন্মদাগ নেমে আসে গভীরতার ঠোঁটে। "এলে তবে?" চোখ ফিরাই। "আমাকে বলছেন?" ঋত্বিক আকাশে নামিয়ে রেখেছেন ঐ দৃষ্টির ভার। ব্যাঙ্গমী। উড়ে এল পাশে। কথাটা তাকেই বলা। শশার নাভির মতো ব্রাত্য আমি। ক্যাঁচ ক্যাঁঅ্যাঅ্যাচ। দুলুনির আপত্তির মুখে ছাই। নৌকোয় উঠে আসা গেল। নজরুল। নিভে আসা চুরুটের ছায়ায় ধোঁয়ার সান্তনা দিলেন একমুঠো। "হল?" দিতির মুখে লাজুক সম্মতির

হাসি। বুলবুল। কে জানে কবে ছইয়ের বুকে পাঁজরের মতো বাসা বেঁধেছে আড়াল। ছড়া হৈ হৈ করে ওঠে। লাল লাস্যে আখেরন নিশ্চুপ।

"একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক! রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্য-নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—"[38]

শান্তিনিকেতন বেয়ে দিতির কাছে আসি। "জানি না, ও ঘাটে যাব কিনা! এপাড়ের গুঁড়ো জীবনের বড় কাছাকাছি।" দিতির বুকে হাসি। গলা জড়িয়ে বলে,"তবে কাজ নেই। নদীতেই ভাসি বরং। বালি হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাবে। বেশ হবে!" আমার কান চুঁইয়ে অস্থিরতা

---

[38] রবীন্দ্রনাথ

নামে। সেই গ্রাম। সেই মাটি। এই নদীর সিঁদুরে সিন্নি ভাসিয়ে রেখেছে চিরকাল। নদী কাঁটাতার রাখে নি কোনো দিন। সেই জল শিরায় শিরায়। আমি দেখি। নৌকোয় উঠে আসেন ভাঁ সঁ। অ্যাবসিন্থের একটা গ্লাস থেকে সবুজ নিয়ে ছুঁয়ে দেন দিগাঙ্গনাকে। লজ্জায় মাথা নামায়। উঠে আসেন সত্যজিৎ। উঠে আসেন ঋত্বিক। ধকধক। কালীমূর্তির জিভের স্পন্দন লাগে আকাশ থেকে মাটিতে। আমি শেষ বারের মতো ওপার আঁকড়িয়ে দিতিকে প্রশ্ন করি—

"যাবে?"

"না।"

"যাবে?"

"না।"

"যাবে?"

"না।"

"যাবে?"

"না।"

"যাবে না?"

"না।"

ছেড়ে দিই ওপারের কাগজের নৌকো। বিবাহিতা। সময়। কোতওয়াল। অপ্সরা। ভাসতে ভাসতে চুপ। ডুব। খটাং খটাং করে নোঙর ওঠে। খেয়া দোলে। জলের ভ্রূকুটি অর্ধেক গেলে অন্ধকার। রোদের আঙুলটা পাশে। মাথার ওপরে উড়ছে ব্যঙ্গমী। দৈত্যপুরীর শ্মশান থেকে এক জীবনের যাত্রা। আমি, দিতি, ছড়া, ছবি। পাশাপাশি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নজরুল হাল ধরেছেন। ছপ ছপ। জলের ওপর পা ফেলছে জোব্বা। দু মিনিট। তারপর। নেই। অস্তি নাস্তির হাতটা ধরে ফেললো ঝপ করে। বিদিশার কাছাকাছি। জন্ম এককে দূরত্ব মাপে ডানা। শালবন শালবন! শালের চুরুটের গন্ধে মেঘ করে আসে ছইয়ের ভেতরে। আমার বাঁদিকে হেমন্তের গুনগুন,"একটু হাওয়া নাই, জল যে আয়না..."! জব্বার জলছাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন নজরুল। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ গেয়ে ওঠেন, "হে গিরিজাপতি, কোথা গিরিধারী...অরুণকান্তি কে গো..."! কে? কে? কে? রবি ঢলে পড়ে। শতাব্দী ঢলে পড়ে। সহস্রাব্দ ঢলে পড়ে। জোব্বা এগিয়ে যায়। কেউ আসন পায়। কেউ পায় না। আখেরনের বুকের তিল শেষ খেয়ার মতো। শেষ সূর্যাস্তের রঙে। শেষ আমি আর দিতির ঠোঁটের আদরে। হয়তো, অন্যজন্মে ছুঁয়ে নেবে জাতিস্মর। তখনও আঙুলে যদি বয়স না ধরে। একটু একটু একটু করে পুড়তে থাকুক বিচ্ছেদ। সহজিয়ার আদরে। উড়তে থাকুক ছাই,

সমুদ্রে বহমান চিতার আকাশে

ছাই ভাসে।

ব্যঙ্গমার জনন-দৃঢ় পাখা

মেলে ধরে চঞ্চু নখ

চুমু থেকে খুনের সংলাপে।

গ্রীবা

তার থেকে থেকে ছড়িয়েছে

অনামিকা ডানার বিস্তার...

অন্ধকারে গর্ভবতী

জরতী সূর্যের

মৃতদেহ

শোনে শেষ শাক্ত উচ্চারণ

"এখানে

শোক

অথবা প্রেম

মেঘের মতো চরে......"

আনন্দ তার জাবর কাটে শুধু। রোজ। রোজ। আর রোজ।

সমাপ্ত।

আলোকলেখ্য—স্বয়ং

৪ নভেম্বর ২০১৮

সকাল ১১টা ৪০

কর্ণান্বিত কুন্তী (১)

দিন শেষে সূর্যের তেজ ফিরে যায় সূর্যে! গলাকাটা লাশটুকুই তবে কুন্তীর? যুগে যুগে ওটুকুই দিয়েছে রাষ্ট্র...

কর্ণাস্ত (২)
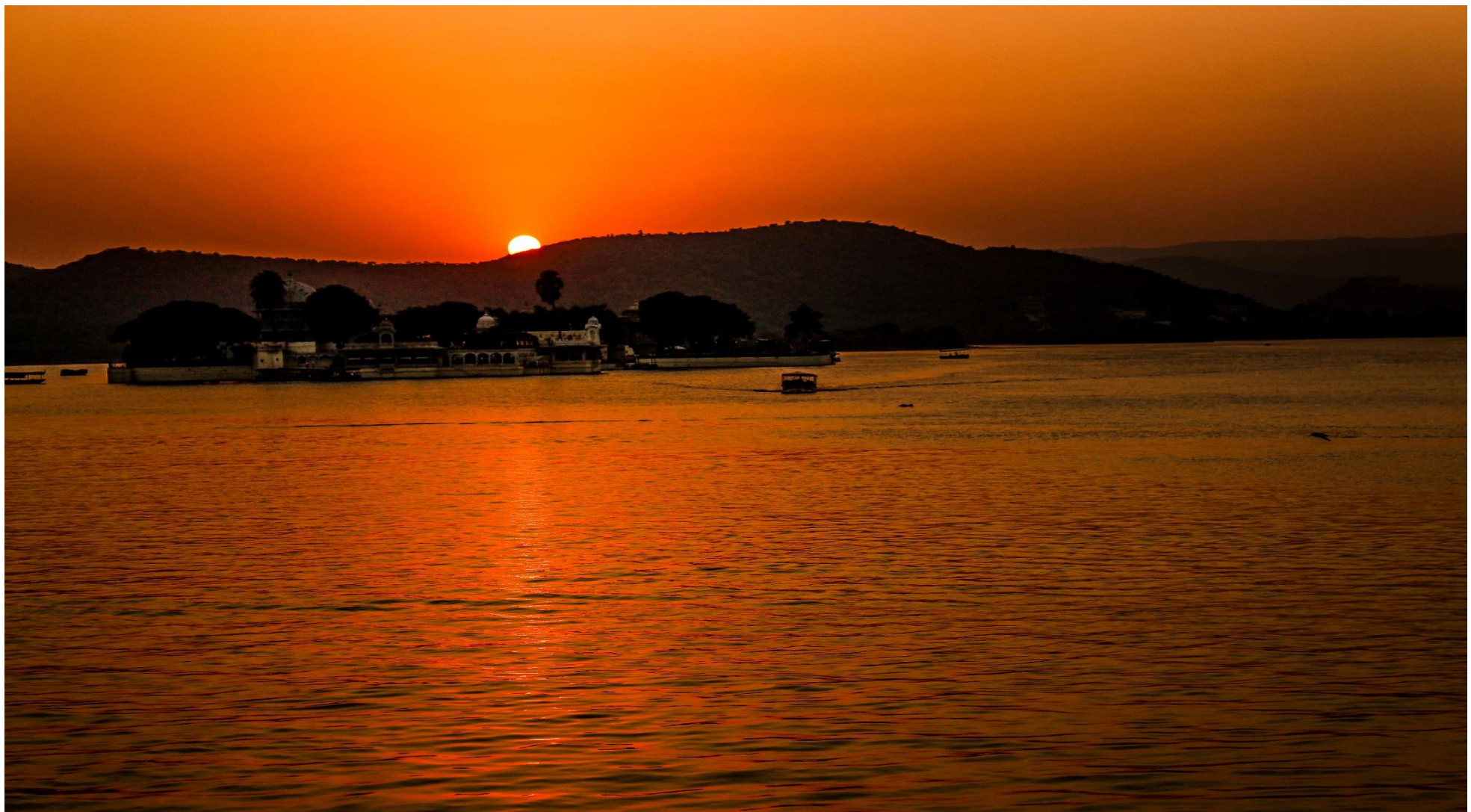
আমি জানি কাকে চিঠি লিখছি। প্রিয় বাতিলবাক্স। এছাড়া চিঠির সদগতি আর কৌন মৌতরমা করবেন! হজমের দোষ বাড়ছে মানুষের, চোখের খিদে পেটে চোঁয়ায় না। কাজেই বাতিলবাক্স, তোমায় হেরি নয়ন ভেড়ি জুড়ে / চাষ করেছি বাবলা শুঁটকি / জড়িয়ে নিও শুঁড়ে।।

গোস্তাখি মৌফ, এ লেখা বাসের লেখা। বাস করতে করতে চলতি কন্ডাক্টরের হাতে গোঁজা টিকিটের লেখা। গোটা লেখাটা ফোনে বাসে বসে লেখা। ড্রাফ্ট। পরে বড়ো স্ক্রিনে কাজ যদিও হয়েছে, ভাবনা ছিল একটা ট্র্যাভেলগ মেরে ঝলসিয়ে খাব, আরামে। কিন্তু ভূতের দুনিয়ায়, সেই হারামজাদা ট্র্যাভেলগের ভূত শুধুই বলে মাছ দে। বাবলা কাঁটাও হয়, শুঁটকিও...কাজেই ট্র্যাভেলগের ভূতকে অল্প বিস্তর দিতে তিনি খেয়েদেয়ে ডায়েরির পাতায় নিদ্রা গেলেন। সেটাই গরম গরম, যা কিনা আদতে ঠাণ্ডা কাঁই, পরিবেশন। এই আর কি! ভুলের রাজ্যে ভুল স্রোত সর্বত্র, ঠিকের মুখে ছাই...এই ভৌতিক ভুলের মাশুল আর আমি গুনতে চাই না। একদিন পাঠক হয়তো গুনবে। অথবা পাঠকের ভূত...